VOL. I

India and the 90's

নব্বই-এর ভারতবর্ষ

সং: ১

INDIA AND THE 90's

নব্বই-এর ভারতবর্ষ

Special Series Vol. I

বিশেষ সংখ্যা - ১

© Copyright 2021 by Third Lane Magazine

All rights reserved. No part of this document may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage or retrieval systems without permission in writing from the publisher. For information, contact: thirdlane.mag@gmail.com

Issue Contributors

Essays:

- Eshan Majumder
- Spandan Bhattacharya
- Senjuti Patra
- Jaba Bairagi
- Debolina Ray
- Saikat Palit

Illustration:

- Suman Mukherjee
- Saikat Palit
- Priyanjana Majumder (Cover)

Editors:

- Chirayata Kushari
- Priyanjana Majumder
- Saikat Palit

Contents/সূচীপত্র

INDIA AND THE 90’s 4

নব্বই-এর ভারতবর্ষ : একটি মুখবন্ধ 8

নব্বই নট আউট 13

ভদ্রলোক নস্টালজিয়া, অতীতচারণার রাজনীতি ও নব্বই পরবর্তী বাংলা ‘সমান্তরাল’ সিনেমা..... 24

Woman Interrupted: A Gender Discourse On 90’S India........ 42

দেবেশ রায়ের উপন্যাস ও বাংলা সাহিত্যের বিষয় আঙ্গিকের অন্য বয়ান: (১৯৯১- ২০০০)........ 63

90’S Food: The Birth Of A Culture........ 73

বাগ আছে হ্যায় 94

INDIA AND THE 90's

An Introduction

Priyanjana Majumder

"*All time is unredeemable*", Eliot tells us.

And yet, it is but the nature of humankind to look back constantly, trying forever to understand that elusive point where its past held a tryst with its destiny. We like to tell ourselves that history is best understood in retrospection, and in the process, end up rewriting it over and over again. Sometimes, though, the act of looking back is nothing more than casual indulgence – nostalgia, especially for a generation you never belonged to, can after all be wonderfully cathartic.

However, when we, at Third Lane, decided to do a bit of retrograde introspection of our own, we decided to be more honest. We decided to pick a decade we thought we "connected with, the most." It is only when we went down the annals of the all-seeing internet

that we realized that we were not the only ones. It seemed that almost the entire country, indeed, the entire world, connected emphatically with the 90s. It is everyone's favourite decade – spawning hashtags to listicles to long-winded analyses with equal fervor.

What is it, we wonder, that makes it such an iconic decade – not just in our country, but throughout the world? At the brink of the 90s, the western worlds were at their peak of prosperity and glamour, producing everything from sitcoms to cellphones at an almost arrogant pace. At the same time, there were deep ideological shifts taking place – with the Berlin wall taking down with it the dream of a utopia, and the Cold War coming to a final, definitive end.

This surreal coexistence of giddy optimism and bleak politics was felt on our homeground as well.

In India, the 1990s began with an assassination and ended with a war. A bloody birth and a bloody demise - and in between, ten tumultuous years. The economy opening up to the world, the advent

of international brands, a complete metamorphosis of the world of entertainment - changes that left a lasting mark in the cultural landscape of the nation. It was the decade of indie pop, of Aishwarya Rai, and Sachin Tendulkar, of A.R. Rahman and Pepsi. But it was also a decade of extreme political violence, from the demolition of the Babri Masjid and the insurgency of Kashmir to the Bombay blasts and the riots it provoked. It was, indeed, the best of times and the worst of times, a decade of blood and glitter.

It seems universally accepted that the 90s changed the world as we know it. Today, as history crumbles around us one more time, as we grapple with the loss of the familiar, and the way forward seems darkly uncertain, it seemed comforting to us to look back once more at the ultimate hurrah of the last century. We like to call ourselves the “90s kids” in tandem with anyone else on social media who can. But perhaps the worst scandal in this characterization is, as John Updike said, - we do not know that we were a generation.

During our course of research, we have found many stories that have been written, re-written and covered better than we ever

could. Surprisingly, however, we have still managed to find things that remain largely under-documented.

And so, Third Lane brings you the 90s - one more time - in vignettes that explore this incessantly relevant decade from different perspectives.

****

নব্বই-এর ভারতবর্ষ : একটি মুখবন্ধ

চিরায়ত কুশারী

'চেনা দুঃখ চেনা সুখ, চেনা চেনা হাসি মুখ;

চেনা আলো চেনা অন্ধকার..'

চারপাশের চেনা মানুষ, চেনা রাস্তা, চেনা দোকানবাজার - পাল্টে যাচ্ছিল দ্রুত, অতিদ্রুত।

গ্লাসনস্ত, পেরেস্ত্রইকা পেরিয়ে গর্বাচেভ এসে গিয়েছেন - ওদিকে ৮৯ তে বার্লিন ওয়াল ভেঙে মিশে গিয়েছে দুই জার্মানি। এরপর নব্বই এর শুরুতেই তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়লো সোভিয়েত।

নব্বই এর গোড়ায় পৃথিবী জুড়ে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে এল উদারীকরণের ঢেউ। বাজার অর্থনীতির এই গ্র্যান্ড প্যারাডাইমে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য ভারতবর্ষ সহ বিভিন্ন দেশে প্রত্যক্ষ বিদেশী পুঁজির প্রবেশাধিকার স্বীকৃত হল। যার কয়েক বছরের মধ্যেই আমরা পরিচিত হবো একটা শব্দবন্ধের সঙ্গে - 'নিওলিবারালিজম' বা নয়া উদারবাদ। মুক্ত বাজার - মুক্ত অর্থনীতি ভারতীয়

সমাজে,মননে ধীরে,খুব ধীরে জায়গা করে নিচ্ছিল। বেশ অনেক বছর পরে, ২০০৭ সালে , যখন এই মুক্ত অর্থনীতির দন্ডাজ্ঞার ছায়া ভারত সহ এই বৃহৎ গ্লোবাল ভিলেজের প্রায় সবার মাথার উপর , নাওমি ক্লেইন তাঁর *The Shock Doctrine : The Rise of Disaster Capitalism*, বইতে লিখছেন, 'The history of contemporary free market is written in shocks...'

প্রকৃতপ্রস্তাবেই বদলে যাওয়া এই অর্থনীতির প্রভাব পড়েছিল সর্বত্র।ভারতীয় গণরুচি , পপুলার কালচার এমনকি খাদ্যাভ্যাস ঝেড়ে ফেলছিল পুরনো পোষাক। 'থার্টি মিনিট'স ডেলিভারি' - এই বাক্যাংশের হাত ধরে ডমিনোজ আর ম্যাকডোনাল্ডসের পিৎজা,বার্গারে মজেছিল সক্কলে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য এমনকি বিনোদন জগতেও সরাসরি কর্পোরেট পুঁজি বিনিয়োগ হচ্ছিল।

১৯৯১: পুঁজির দাপট তখনো তেমনভাবে চেপে বসেনি বাঙালির সমাজজীবনে। বাঙালি মধ্যবিত্তের চৌকাঠ থেকেই মৃণাল সেনের ক্যামেরা পৌঁছে গেলো বার্লিন ওয়াল; ইতিহাসে পথ খুঁজে নিল- 'মহাপৃথিবী'। ওদিকে তখন আস্তে আস্তে বাঙালি মধ্যবিত্তের ড্রয়িং রুমের দখল নিচ্ছেন গৌতম ঘোষ, অপর্ণা সেন , বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, ঋতুপর্ণরা। সমাজ- বাস্তবতার বিবরণ, বাঙালি মধ্যবিত্তের রিপ্রেজেন্টেশন অন্যভাবে ক্যামেরায় ধরছিলেন তাঁরা। পিছিয়ে ছিলনা বলিউডও। মীরা নায়ার, সুধীর মিশ্র, নাগেশ কুকনুর প্রমুখরা মূলধারার বলিউডি প্লট থেকে বেরিয়ে অন্য

আঙ্গিকে কাজ করছিলেন। বলিউড মেনস্ট্রিম গানের পাশাপাশি গড়ে উঠছিল ইন্ডিপেন্ডেন্ট গানের স্বতন্ত্র একটা রাস্তা - ভারতীয় ব্যান্ড। সর্বভারতীয় স্তরে পলাশ সেনের ইউফোরিয়া বা রাহুল রামের ইন্ডিয়ান ওশেন সেসময় প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করে। আর নব্বইয়ের বাংলা গান? - সে তো এক বিস্তৃত অধ্যায়! সাল ১৯৯২ - জোন বায়েজের মায়াবী গলায় পৃথিবী শুনে ফেলেছে -'স্পিকিং অফ ড্রিমস'। বাংলা গানের শ্রোতারা আকুল হয়ে অপেক্ষায় ছিলেন নতুন কোন উচ্চারণের, যিনি সমকালের মাত্রায় বেঁধে নেবেন তার গান। দেশকাল জুড়ে চলা ওলটপালটকে চকিতে জুড়ে নেবেন তার শিল্পবোধে। ঠিক এমন সময় এক প্রৌঢ় যুবকের রাগী গলায় ভেসে এল -

'অধিকার বুঝে নেওয়া প্রখর দাবিতে/ সারা রাত জেগে আঁকা লড়াকু ছবিতে...'

বাংলা গানের স্থানাংক বদলে গেল। এর সাথে সাথেই আমাদের প্রেমিকারা কেউ হয়ে উঠল মালা, কেউ বা নীলাঞ্জনা।

অন্যদিকে বাংলা সাহিত্যের বড় বাঁকবদল এই ৯০ তেই। দেবেশ রায় লিখছেন - 'তিস্তাপুরাণ', 'ইতিহাসের লোকজন'; অপরপ্রান্তে নবারুণ ভট্টাচার্যের প্রথম উপন্যাস 'হারবার্ট' প্রকাশিত হচ্ছে। এক ক্রান্তিকালের দাস্তান ধরা থাকছে তাঁদের লেখায়। একে একে উঠে আসছেন কিন্নর রায়, অমর মিত্র, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, বাণী বসু প্রমুখ। মফস্বল আর কলকাতা থেকে প্রকাশিত লিটল

ম্যাগাজিনগুলির বিবিধ পরীক্ষা নিরীক্ষা বাংলা সাহিত্যকে সাবালক করে তুলছে। বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে আশ্চর্য উন্মাদনা।

১৯৯২: ৬ই ডিসেম্বর; অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল । মোড় ঘুরে গেল ভারতীয় রাজনীতি আর সমাজজীবনের। ভারতীয়ত্বের একটা নতুন সংজ্ঞা নির্মাণের ধীর আর অন্তঃসলিলা প্রক্রিয়া শুরু হল সারা দেশ জুড়ে, যার সুদূরপ্রসারী অভিঘাত আজকে দাঁড়িয়ে বুঝে নেওয়া যায়। তবে শুধু ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় নব্বই দশকের শেষাংশে উত্থান ঘটছে দক্ষিণপন্থী পপুলিস্ট রাজনীতির - যে প্রবণতা রাষ্ট্রশাসনের অভিমুখ ধীরে ধীরে বদলে দিচ্ছিল।

এখন প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, ৯০ কেন? আসলে ঐ দশক আমাদের শকুন্তলার অঙ্গুরীয়; আমাদের ইস্কুলছুটি, আমাদের ঝিলের ধার, আমাদের টিউশনবেলা। ৯০ এমন একটা সময়, যখন আমাদেরই চারপাশে অনেক কিছু ঘটে গেছে - সশব্দে আর নিঃশব্দে। প্রায় দুই দশকের দূরত্বে দাঁড়িয়ে আমরা বুঝতে চেয়েছিলাম ৯০কে - যাকে ঘিরে বিশ্লেষণ অপ্রতুল হলেও আবেগের কমতি নেই।

ইন্টারনেটে ৯০'স কিড, ৯০'স কালচার ইত্যাদি নিয়ে নস্টালজিয়ার যে গণ-উন্মাদনা চোখে পড়ে, তার বিপ্রতীপে ছিল আমাদের অনুসন্ধান। যে বিপন্নতার

হাওয়া আজ ঘুরপাক খায় আমাদের মাথার চারপাশে - তার উৎসভূমি কি ছিল সেই পেরিয়ে আসা ৯০?

****

নব্বই নট আউট

ঈশান মজুমদার

প্রচ্ছদঃ সুমন মুখার্জী

নব্বইয়ের দশক! নামটার মধ্যে কী এমন লুকিয়ে রয়েছে বলুন তো? মাদকতা? উন্মাদনা? একটা গোটা প্রজন্মের বেড়ে ওঠা? নাকি 'পুরাতনের হৃদয় টুটে আপনি নূতন উঠবে ফুটে'র কাব্যময়তা? এই গোটা সময়টা জুড়ে বহু উত্থান পতন রোমাঞ্চের প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে থেকে গেছে আমাদের দেশ। তবে মানুষের জীবনের অন্যতম রোম্যান্টিসিজমের অবস্থান কেমন ছিল এই সময়টায়? ওহ, বুঝতে পারলেন না? আমি বলছি খেলাধুলার জগৎটার কথা। আসলে নব্বইয়ের এই সময়টাকে ধরতে গেলে একটা আর্থ সামাজিক পরিস্থিতি এবং তার সঙ্গে তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার কথাও বুঝতে হবে। ঠিক কেমন ছিল সময়টা?

কাট –

১৯৮৯ সাল বার্লিনের প্রাচীর ভেঙে পড়ল। দুই জার্মানির সেই মিলনক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে সুনীল গাঙ্গুলী লিখেছিলেন ইতিহাসের স্বপ্নভঙ্গ। ১৯৯১ সালে একদিকে সোভিয়েতের পতন ঘটলো। নাকি কমিউনিজমের পতন বলবো? বাঙালি তখন যেন সামান্য ঝিমিয়ে পড়েছে। মাঝেমধ্যে নন্দনে ছবি অথবা আকাদেমিতে নাটক দেখতে ভিড় জমায়। কখনও কখনও মুখর হয়ে ওঠে খেলা নিয়ে। ঠিক এমন সময়ে বাংলার মাটিতে নতুন স্বর উঠে এল। চাঁদ ফুল জোছনার কথা ভুলে আধমাথা টাকা নিয়ে ভুঁড়িওয়ালা একটা লোক মঞ্চে উঠছেন। তারপর কোনো ভণিতা না করে গেয়ে উঠলেন – "মান্না পিকে চুনীর ছবি বিরাট সম্বল!" সুমনের আবির্ভাব বাংলা গানের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু বাংলার গানের জগতে যখন নতুনের জোয়ার আসছে, তখন বাংলার খেলাধুলার অবস্থানটা ঠিক কোথায় ছিল? মান্না-পিকে-চুনীর ছবিই কি তাদের একমাত্র সম্বল হয়ে ভাগশেষের মতো পড়ে ছিল? আরও বড়ো করে যদি দেখতে চাই, তবে প্রশ্নটা হওয়া উচিত: 'নব্বইয়ের

দশকে ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রের হালহকিকত' কেমন ছিল? এমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা সেখানে ঘটেছিল যার কারণে আজ আড়াই দশক শেষে বিচারসভা বসিয়েছি?

মনে রাখতে হবে, বাংলার ফুটবলের শেষ আইকনিক শিল্পী কৃশানু দে তখন প্রায় অস্তাচলের পথে। ফিরে এসে একটা চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু আশির জাদু হারিয়ে গিয়েছিল চোটের পরে। তাহলে? এই তাহলের উত্তর দিতে আমরা আশ্রয় নেব একটা আট অক্ষরের মারাঠির ছায়ায় – শচীন তেন্ডুলকর।

শচীনের উত্থান ভারতীয় ক্রিকেটের রূপটাকেই বদলে দিয়েছিল। তার কারণ, ক্রিকেট যতই জনপ্রিয় হোক না কেন, অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে খুব লাভজনক মুক্তাঞ্চল তখনও ছিল না। শচীন এসে ভারতীয় ক্রিকেটকে বিপণনযোগ্য করে তুললেন। সেই সময়ের বহু সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল, শচীন তেন্ডুলকর এমনই একটা নাম যা কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারীকে এক সুতোয় বেঁধে ফেলতে পারে। বাবরি মসজিদ যে দশকে ধ্বংস হয়েছে; নরপিশাচদের উল্লাস শহরের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে; এমন একটা সময় সারি সারি মানুষ উপচে পড়ছে একটি টিভির সামনে – শচীন তেন্ডুলকর ব্যাট করছেন! কোথায় হিন্দু, কোথায় মুসলমান, শচীন তেন্ডুলকর এক অখন্ড ভারতবর্ষ। এখন তাঁর টুইট নিয়ে যতই হইচই হোক না কেন, তাঁর গুরুত্ব সেই জানে যে বেঁচে নিয়ে তাঁর সময়ে।

ক্রিকেট নিয়ে কথার মাঝখানেই রাজনীতি এসে পড়লো। ঠিক যেমন রাজনীতির মাঝে এসে পড়েছিল ক্রিকেট। শঙ্খ ঘোষের একটি কবিতার কথা মনে পড়ে গেলো –

"এ এমন সময় বাঁচার

যখন নেতারা চলে প্রকাশ্যেই হামা দিয়ে লুম্পেনের তর্জনীসংকেতে
এ এমন সময়, যখন
শুধুই চিৎকারশব্দে যে-কোনও আকাট মিথ্যে সুঘোষিত সত্য হয়ে ওঠে
এ এমন সময়, যখন
আইনের শাসনহীন গোটা দেশে একনায়কের ইচ্ছা একমাত্র আইন
এ এমন সময়, যখন
এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় নিরপরাধের মাংসে ঘাতকেরা নিত্য করে হোম—
সেসব দেখেননি আপনি কবি
আপনি শুধু দেখেছেন উৎসবের সমারোহে উন্মুখর প্রসাধিত রোম!"

প্রসাধিত রোম দেখার কথা যখন উঠলোই তখন বলি, ক্রিকেটের উত্থান ভারতের বহু খেলার কবরে শেষ পেরেকটুকু পুঁতে দিয়েছিল। বিষয়টিকে অন্যভাবেও দেখা যায়। অন্যান্য খেলা যেন সামাল দিয়ে উঠতে পারলো না ক্রিকেটের সঙ্গে। কিন্তু কেন পারলো না? এর একটা প্রধান কারণ বাণিজ্যিকরণ। হকি, ফুটবল অথবা কুস্তির মতো খেলার যে আঙ্গিক, তাঁর সঙ্গে বিজ্ঞাপন খাপ খায় না। আমি জানি আপনারা প্রশ্ন করবেন, তাহলে বিশ্বমঞ্চে এই খেলাগুলি এত টাকার বন্যা বইয়ে দিচ্ছে কিভাবে? উত্তর হল, খেলার নিয়ামকদের দেখুন। ইটালিতে ফুটবলকে গিলে ফেলেছিল মাফিয়ারা। বিশ্বখ্যাত মারাদোনার সঙ্গেও মাফিয়াদের যোগ উন্মোচিত হয়ে গিয়েছিল। ব্রিটেনে ধনকুবেররা আসতে শুরু করেন। যদিও নব্বই দশকে রোমান আব্রাহামোভিচ অথবা মধ্যপ্রাচ্যের শেখদের হাতে খেলাটা চলে যায়নি। কিন্তু সাইডলাইনের ধারের বিলবোর্ডে বিজ্ঞাপনের ব্যবহার শুরু হয়ে গিয়েছিল। বার্কলেসের মতো সংস্থা ইংলিশ প্রিমিয়ার লীগকে স্পনসর করতে শুরু করলো।

শুধু তাই নয়, অভিজাত কোম্পানিরা টেনিসের মঞ্চে চলে এলেন। একেকজন খেলোয়াড়কে একেকটি সংস্থা প্রায় কিনে নিল। যার ফলস্বরূপ একবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রজার ফেডেরারের সঙ্গে রোলেক্সের মতো কোম্পানির অন্তরঙ্গতা তৈরি হল। অন্যদিকে, অ্যান্ডি রডিককে স্পনসর করতে শুরু করলো লাকোস্টে। অর্থাৎ ক্রীড়াকে পণ্য রূপে ব্যবহার করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছিল নব্বই দশক।

ভারতীয় ক্রিকেটে এই কাজটিই করে দেখিয়েছিলেন শচীন তেন্ডুলকর। একইসঙ্গে জগমোহন ডালমিয়ার কথাও অগ্রাহ্য করা যায় না। তবে নব্বইয়ের শুরুরদিকে তার প্রভাব আন্তর্জাতিক আঙিনায় সেভাবে ছিল না। ধনকুবের মার্ক মাসকারেনহাসের ওয়ার্ল্ড টেল যখন শচীনের সঙ্গে বিশাল অঙ্কের চুক্তি করে ফেললো, সম্পূর্ণ সমীকরণটাই বদলে গেল। জেন্টলম্যান’স গেম রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল ছিয়ান্নবইয়ের বিশ্বকাপের মধ্যে দিয়ে। ভারতীয় ক্রিকেটে ত্রিদেশীয় সিরিজ শুরু হল – ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা-কেনিয়া। সকলেই জানতো কেনিয়া কোনোদিনই কোনোদিনই বাকি দুই দেশের সঙ্গে পারবেনা। কিন্তু এই সিরিজগুলোর মধ্যে দিয়ে খেলাটার প্রসার ঘটতে লাগলো। সৌরভ গাঙ্গুলী উঠে এলেন বাঙালির নতুন আইকন হিসেবে। একটা কথা এই ফাঁকে বলে নেওয়া দরকার, অনিল কুম্বলে কম বড়ো খেলোয়াড় ছিলেন না সেই সময়ে। কিন্তু ওয়ার্ল্ড টেল খুব স্পষ্টভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছিল খেলোয়াড়ি মাপকাঠি নয়, জন এবং গণের মাঝখানে গ্রহণ্যযোগ্যতাই আসল কথা।

সাদা পোশাক ছেড়ে রঙিন পোশাক, আর রাতের আলোয় ক্রিকেট এসে গিয়েছিল বহুদিন আগেই। এবার বিজ্ঞাপন আসতে শুরু করলো একের পর এক। বিজ্ঞাপনদাতারা দেখলেন, ওভারের মাঝের বিরতিটুকু তাদের কথা বলার জন্য

উপযুক্ত। ঝাঁকে ঝাঁকে উঠে এল পণ্য, ক্রিকেটাররা লাখপতি থেকে কোটিপতি হতে শুরু করলেন। আপনাদের হয়তো মনে থাকবে, এমন বহু পণ্য প্রকাশ্যে আনা হত বিশ্বকাপের সময়ে। অর্থাৎ, ক্রিকেটের প্রতিযোগিতাগুলি বাজারের নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠছিল ধীরে ধীরে। তবে আলো যখন থাকবে, অন্ধকারও তখন ছায়া ঘনাবে সেটাই স্বাভাবিক। মশালা ম্যাচ শুরু হল, মাফিয়ারা এসে পড়লেন ভদ্দরলোকের খেলায়! দাউদের আস্তানা থেকে কয়েকটা ফোন বদলে দিতে লাগলো ম্যাচের রেজাল্ট। মধ্যপ্রাচ্যে মূলত শারজায় শুধু হল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। একই সঙ্গে শুরু হল গড়াপেটা – মুকেশের নামটা মনে পড়ছে? আমাদের অবশ্য ক্ষণস্থায়ী স্মৃতি; ভুলে গেলাম অতি সহজেই। আবারও একটা ছয়, আবারও হই হই করে উঠলো দর্শক! তবে সে এমন সময় ছিল, যখন পথ চলতি লোকে চেঁচিয়ে উঠতো,

—দাদা কত স্কোর?

—ভারত তিরিশে দুই, আড়াইশো করতে হবে।

—শচীন আছে?

এই ‘শচীন আছে’র উত্তর অনেক মানুষকে পরের বাক্য বলার সুযোগ করে দিত। শচীন আউট হলেই টিভি বন্ধ! আবার শচীন আউট হলেই বেটিং শুরু!

এবার একটু অন্যদিকে তাকানো যাক – বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্রীড়ামঞ্চ – অলিম্পিক। ১৯৫২ সালে কেডি যাদবের কুস্তিতে পদক পাওয়ার পরে, ব্যক্তিগত পদক আমাদের কপালে আর জোটেনি। তবে চুয়াল্লিশ বছর বাদে ১৯৯৬ সালে আটলান্টা অলিম্পিকে টেনিসে ব্রোঞ্জ পেলেন লিয়েন্ডার পেজ। লিয়েন্ডার মহেশ জুটি বাঁধলেন তার কিছু বছরের মধ্যেই এবং গ্র্যান্ডস্ল্যামও জিতে ফিরলেন।

ব্যাডমিন্টনের জগতে উঠে আসছিলেন পুলেল্লা গোপীচাঁদ। ১৯৯৮ সালের কমনওয়েলথে দলগত বিভাগে রূপো এবং ব্যক্তিগত বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি থাকতে এসেছেন। ফুটবলে শুরু হয়েছিল জাতীয় লীগ। প্রথমবারেই জেসিটি চ্যাম্পিয়ন হয়ে তাক লাগিয়ে দিল সকলকে। ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানও অবশ্য পালটা জবাব দিল পরের কয়েকবছরের মধ্যেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে। বাঙালি খেলোয়াড়দের মধ্যে উঠে আসছিলেন দীপেন্দু বিশ্বাস, অসীম বিশ্বাস, দেবজিত ঘোষরা। ভারতীয় ফুটবলের রঙিন ফানুসটা তখন বিশ্বকাপের মঞ্চে উত্তরণের স্বপ্ন দেখছে। সে স্বপ্ন অবশ্য পরের সাতাশ বছরেও সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। কিন্তু নব্বই দশকেই উঠে এসেছিলেন ভারতীয় ফুটবলের আইকন বাইচুং ভুটিয়া। সিকিমের এক ছোট্ট গ্রাম তিংকিতাম থেকে তাঁর স্বপ্নের দৌড়টা অনেক নাম না জানা প্রান্তের প্রতিভাবানদের স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেছিল। নব্বইয়ের শেষদিকেই বিদেশে খেলার জন্য পাড়ি দেন বাইচুং। ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ডিভিশনের ক্লাব বারি এফসি তখন এতই মত্ত ছিল তাঁকে নিয়ে যে, তাঁর ও ক্লাবের নামানুসারে বিরিয়ানি রেঁধে নামকরণ করেছিল – ‘বাইচুং বিরিয়ানি’!

আমরা যারা সেই সময় বড়ো হয়েছি, তারা সকলেই বাইচুং হওয়ার স্বপ্ন দেখতাম মনে মনে। শুধু কি বাইচুং, ডগলাস গ্রাউন্ডে দৌড়লে সৌরভ হওয়া যায় অথবা শিবাজি পার্কে আরেকজনের শচীনের খোঁজে কে না মাতেনি সেই সময়? কিন্তু এই সবকিছুর মাঝে ক্রিকেট যেন গিলে ফেলছিল বাকি খেলাগুলোকে। ফুটবল খেলে যে টাকা পাওয়া যেত তার কয়েকগুণ টাকা ক্রিকেট থেকে আয় করতে শুরু করেন খেলোয়াড়রা। হাওয়া ফুরিয়ে যাওয়া ফুটবলে শেষ লাথিটা হয়তো মেরেই দিয়েছিল বাঙালি যুবসমাজ। শচীনের ব্যাটে এম আর এফ-এর লোগো আসার সঙ্গে সঙ্গেই বাজারে নকল এম আর এফ ব্যাট চলে এলো।

দোকানে দোকানে ভরে উঠলো ক্রিকেট প্যাক। বিস্কুটের স্ক্র্যাচ কার্ড ঘষে ক্রিকেটারের সান্নিধ্য পাওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে গেল দেশের কোটি কোটি মানুষ। তারই মাঝে, বাংলার ফুটবল ১৯৯৭ সালের ফেড কাপ সেমিফাইনালে একটা বিস্ফোরণ দেখছিল! এক লাখ একত্রিশ হাজার দর্শকের সামনে বাইচুং ভুটিয়ার হ্যাটট্রিকের দৌলতে মোহনবাগানকে ৪-১ গোলে হারিয়ে দিল চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল। পিকে বনাম অমল দত্তের শেষ মনে রাখার মতো স্মৃতি। নব্বই দশকের শুরুর দিনগুলি যদি মারাদোনার প্রত্যাবর্তন নিয়ে মাতোয়ারা হয়ে থাকে, তবে শেষের দিনগুলি ছিল রোনাল্ডো-জিদানের মৌতাতে ভরপুর। একশো চৌত্রিশ নম্বরে থাকা দেশে পাড়ায় পাড়ায় বিভাজন হয়ে যেত অন্য দেশের খেলা নিয়ে। কিন্তু বন্ধের দিনেও বল ভেবে বোমায় হাত দিল ছোটো ছেলেরা ক্রিকেট খেলার মাঝে। ছিন্নভিন্ন লাশের মাঝে বেঁচে থাকলো শুধুমাত্র ক্রিকেট।

জাতীয় টেবিল টেনিসের যুব পর্যায়ে জিতে টেবিল টেনিসে উঠে আসছিলেন মৌমা দাস এবং পৌলমী ঘটক। ভারতীয় হকির ডুবন্ত তরীকে একা ভাসিয়ে রাখার চেষ্টা করছিলেন ধনরাজ পিল্লাই। স্প্রিটিংয়ে ১৯৯৮ সালের এশিয়ান গেমসে তাক লাগিয়ে দিলেন জ্যোতির্ময়ী শিকদার, ৮০০ এবং ১৫০০ মিটারে সোনা জিতে। নব্বইয়ের শেষভাগে ব্যাঙ্গালোর ফেডারেশন কাপে অঞ্জু ববি জর্জ জাতীয় রেকর্ড গড়লেন লং জাম্পে। যুব পর্যায়ে দুর্দান্ত প্রদর্শনীর দাপটে অ্যাথলেটিক্সে উঠে আসছিলেন সোমা বিশ্বাস। কিন্তু আজ যদি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি সোমা বিশ্বাসের সেরা পারফরম্যান্স কোথায় বলতে পারেন? আপনি মাথাও চুলকোবেন না, ঔৎসুক্যও দেখাবেন না। শুধু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলবেন, “পরে গুগল করে নেবো।”

এখন সবকিছুর পরে একটা প্রশ্নই পরে থাকে – ক্রিকেট পেরেছে, বাকিরা পারেনি কেনো? তার একটা উত্তর হয়তো মিডিয়ার উত্থানের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে। যেকোনো ঘটনা বা দুর্ঘটনা মিডিয়ার মাধ্যমে জনমানসে আঘাত করে। খেলার জন্য সেই সময়ে বরাদ্দ থাকতো পাঁচ মিনিট। তার মধ্যে তিন মিনিট ক্রিকেট নিয়ে কথা বলা হত। বহু মিডিয়ার স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বরা ক্রমাগত ক্রিকেট নিয়ে লিখে লিখে খেলাটাকে ভাসিয়ে রাখছিলেন মানুষের মনে। মাঝে মাঝে চিৎকার উঠতো, দশটা দেশের খেলা আবার খেলা নাকি? কিন্তু ভেবে দেখুন, বাকি দেশে খেলাটির প্রসারে আন্তর্জাতিক নিয়ামক সংস্থাগুলি সেভাবে গুরুত্বই দেয়নি। কেন? মালেশিয়া, চীন, রাশিয়া অথবা আমেরিকার মতো দেশে ক্রিকেটের প্রসার ঘটেনি কেন? ফুটবল বিশ্বকাপ তো আয়োজিত হয়েছিল আমেরিকাতে যখন তাদের ফুটবল নিয়ে প্রায় ধারণাই ছিল না (রেফারেন্স – ১৯৯৪ বিশ্বকাপের তথ্যচিত্র)। একই বিষয় ক্রিকেট নিয়ে হল না কেন? আন্তর্জাতিক ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থার নীতিগুলি স্টাডি করলে একটা বিষয় মনে হয় বারবার, ক্রিকেটকে একটা ব্যবসায়িক পণ্যরূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিল সংস্থাগুলি। টেস্ট ক্রিকেটের সংখ্যা কমিয়ে ক্রমাগত ওয়ান ডে সিরিজের দশক হল নব্বই দশক। খেলাটি বিস্তৃত হয়ে হাতের বাইরে চলে এটি তারা চাননি। দুহাজার সালে বাংলাদেশ টেস্ট খেলার ন্যুনতম যোগ্য না থাকা সত্ত্বেও স্টেটাস পেয়ে যায়। কেন? ভারতের পার্শ্ববর্তী দেশ হওয়ার কারণে তো বটেই, খেলার প্রসারের ক্ষেত্রেও একটা বিরাট বড়ো পদক্ষেপ ছিল। বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে যুগের হাওয়া বইয়ে দেওয়ার সবচেয়ে বড়ো আক্ষেপের জায়গা এটাই হয়ে রইলো যে গত কুড়ি বছরে বাংলাদেশ টেস্ট খেলায় আদৌ তেমন দাগ কাটতে পারলো না এবং একই সঙ্গে ফুটবল ও অন্যান্য খেলার প্রায় অপমৃত্যু ঘটলো দেশটিতে।

তাই এতকিছু সত্ত্বেও নব্বইয়ের দশকের সবচেয়ে বড়ো আক্ষেপের জায়গা ছোটো খেলাগুলির হারিয়ে যাওয়া। ইডেনের মতো মাঠ বাংলায় ফুটবল নব্বই দশকে পেলোই না সেভাবে। যুবভারতীর রক্ষণাবেক্ষণের হাড়ির হাল, বহু খেলোয়াড়ের জীবন শেষ করে দিয়েছে। তার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক টানাপোড়েনে খেলোয়াড়দের জীবন নষ্ট হয়ে গেছে বহুক্ষেত্রে। বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বহু আকাদেমি। কিছুক্ষেত্রে শুধুমাত্র শিলান্যাসই হয়েছিল, বল আর গড়ায়নি। কাবাডি, খো খো ভুলে ক্রিকেট ব্যাট হাতে তুলে নেওয়ার দশক ছিল নব্বই। লিবারেলাইজেশন গ্লোবালাইজেশন প্রাইভেটিজেশনের যুগে খেলার জগতেও কর্পোরেটদের আনাগোনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাহলে কেন মনে রাখবো এমন সময়কে? শুধুমাত্র এই কারণেই যে অনেকগুলো ঘটনার সাক্ষী হয়েছিল নব্বইয়ের দশক। কার্গিল যুদ্ধের দামামার আশেপাশেই ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ; অথবা, ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান দ্বৈরথ; এই একটা দশক মানুষকে অনেককিছু দিয়েছিল। প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছিল। ভারতে ১৯৯৬ বিশ্বকাপের উদ্বোধন ঘটে লেজার শো দিয়ে। 'টেলিভিশনের ছাতা' আর 'সান্ধ্য সিরিয়ালের মোহ' পিষে ফেলতে শুরু করেছিল কলকাতাসহ গোটা ভারতকে। অলিম্পিককে গুরুত্ব না দেওয়ারই দশকও নব্বই। অলিম্পিকে কোনওরকম পরিকল্পনা ছাড়া বিপুল অংশগ্রহণকারীর দল নিয়ে গিয়ে জঘন্যভাবে পরাজিত হওয়া এবং ক্রমাগত অজুহাত দেওয়ার দশকও ছিল নব্বই।

সত্যিই হয়তো অনেককিছু ছিল না, হয়তো অনেককিছু পাওয়া হয়নি। তবে এই না পাওয়ার মাঝে সবকিছু ছাপিয়ে একটা কথাই মনে হয় এখন দাঁড়িয়ে। হয়তো অনেক বছর পরে আমাদের চুলেও পাক ধরবে। ঝুঁকতে অসুবিধা হবে অথবা ঝুঁকে যাবো চিরতরে। তখন যদি কফি নিয়ে বসে দূর দিগন্তে অস্তমিত

সূর্যের দিকে চেয়ে থাকি, মনের মধ্যে যেন ওয়েডনেসডে ছবির শেষ দৃশ্যের কথাগুলোই মূর্ত হয়ে ওঠে প্রতি মুহূর্তে –

"*পর জো ভি থা, আচ্ছা থা........*"

****

ভদ্রলোক নস্টালজিয়া, অতীতচারণার রাজনীতি ও নব্বই পরবর্তী বাংলা ‘সমান্তরাল’ সিনেমা

স্পন্দন ভট্টাচার্য

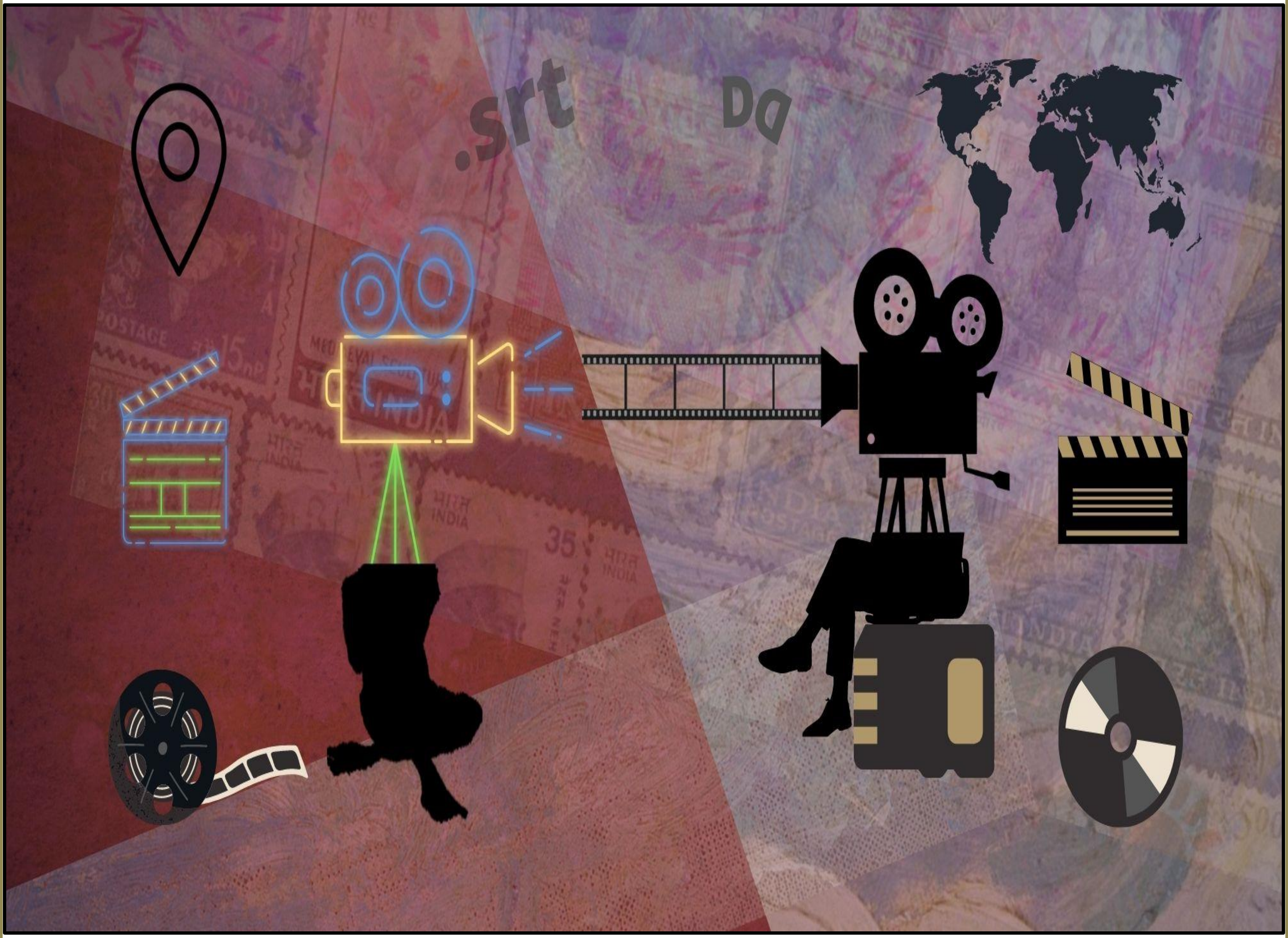

প্রচ্ছদঃ সৈকত পালিত

গোটা পৃথিবীর চলচ্চিত্রে, আঞ্চলিক বাজার ছেড়ে বিশ্ব মানচিত্রে জায়গা করে নেওয়ার প্রবৃত্তি, নব্বই দশকের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আবার এই বিশ্বায়িত চলচ্চিত্রেই প্রবলভাবে লক্ষ করা যায় অঞ্চল-সংস্কৃতির অস্মিতার এক নস্টালজিক পাঠ। বিশেষ করে এশিয়া মহাদেশে এই প্রবৃত্তি চোখে পড়ার মত। একদিকে আন্তর্জাতিক আর্ট-চলচ্চিত্রের বাজারে ঝ্যাং জিমু, চেন কাইজে (চীন) অথবা কিম কি দুক-বং জুন হো'র (দক্ষিন কোরিয়া) মত এশিয়ান অঁতরদের নজরকাড়া উপস্থিতি, অন্যদিকে আমেরিকা, ইউনাইটেড কিংডম ও কানাডার মত দেশে ভারতীয় মূলধারার ছবির প্রতিনিধিত্ব করে হিন্দি সিনেমার ব্র্যান্ড বলিউড হয়ে ওঠা। আমাদের দেশীয় চলচ্চিত্রের দিকে তাকালে দেখব বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের ছোঁয়ায় নব্বই-এর গোড়াতেই ভারতীয় ছবির কর্পোরেটিকরণ ও বাজারের নিরিখে আমূল পরিবর্তন হয়- হিন্দি ছবির ক্ষেত্রে আমরা যে পরিবর্তনকে এককথায় বলিউড নামে চিনি। নব্বই-এর মাঝামাঝি 'দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে যায়েঙ্গে'র (আদিত্য চোপরা, ১৯৯৫) হাত ধরে যখন ব্র্যান্ড বলিউড বিস্তৃত হচ্ছে, তখন পশ্চিমে বাজার বৃদ্ধির পাশাপাশি এক ডায়াস্পোরিক হিরোর কল্পনা হিন্দি ছবির অন্যতম চরিত্র হয়ে উঠছে। বিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত এই নায়কদের দেশে ফেরার আকুতিকে মূলধন করে প্রাচ্য বনাম পাশ্চাত্যের এক নব্য মেলোড্রামা নিয়ে এসে বিপুল মাত্রায় জনপ্রিয় হয়ে উঠছে বলিউড – অন্যদিকে এগ্‌জটিক ভারতের কল্পনাকে মূলধন করে আন্তর্জাতিক জনপ্রিয়তার নতুন মাপকাঠি তৈরি করছে 'মুথু' (কে এস রবিকুমার, ১৯৯৫)-র মত তামিল ছবি। প্রসঙ্গত জাপানে 'মুথু'র

মুক্তি ও বাণিজ্যিক সাফল্য তামিল চিত্রতারকা রজনীকান্তের জনপ্রিয়তায় নতুন মাইল ফলক নিয়ে আসে। নব্বই দশকের বিশ্বায়ন-প্রবণতা এভাবেই ভারতীয় ছবির বাজারে নতুন গঠন-গড়ন নিয়ে আসতে থাকে।

সমাজতাত্ত্বিকেরা বলবেন নব্বই-এর এমন সাংস্কৃতিক নির্মাণের একটা বৈশিষ্ট্য হল বহির্বিশ্বের প্রতি অদম্য আকর্ষণের পাশাপাশি ঘরে ফেরার পিছুটান – গ্লোবালাইজেশনের হাত ধরে এক নতুন রকমের লোকালাইজেশন। এই গ্লোবাল-লোকাল সমীকরণের আলোয় নব্বই-পরবর্তী বাংলা ছবির মধ্যে যেমন কিছু চেনা ছক লক্ষ্য করা যায়, আবার অনেক অচেনা অভিমুখও নজরে পড়ে । মনে রাখা দরকার, যে উদারীকরণের হাওয়ায় হিন্দি ও অন্যান্য আঞ্চলিক ছবির কর্পোরেটিকরণে নব্বই-এর গোড়াতে হলেও , বাংলায় তার প্রভাব একটু দেরীতে বুঝতে পারি আমরা। বাজারের নিরিখে বাংলা ছবিতেও কিছু পরিবর্তন হয়, কিন্তু ছকগুলো একটু অন্য রকম আর পরিবর্তনের কুশলীরাও খানিকটা আলাদা। আমরা বম্বের যে পরিবর্তিত মিডিয়া ও কালচার ইন্ডাস্ট্রিকে বলিউড নামে চিনি, টালিগঞ্জের স্টুডিও পাড়াতেও অনুরূপ একটি মিডিয়া নির্মাণ, থুড়ি, টলিউড এসে পড়ে। কিন্তু ব্র্যান্ড টলিউড পরিচিতি পায় নব্বই-এর শেষে, এবং আরো ভালোভাবে ২০০০ পরবর্তী সময়ে । কর্পোরেট হাওয়া ঢুকে পড়ে বাংলা ছবিতেও – আর প্রবাসী চরিত্রের হাত ধরে আসতে থাকে 'বং কানেকশন' (২০০৬)-এর মত ছবিদের ডায়াস্পোরা কল্পনা। কিন্তু নব্বই-এর বাংলা ছবির বাজারের অন্যতম বিশেষ দিক কিছু ছোট প্রযোজকদের উত্থান ও তাদের বিনিয়োগের জল-হাওয়ায়

বেড়ে ওঠা এক নব্য শহুরে ‘সমান্তরাল’ ছবি। ঋতুপর্ণ ঘোষের পরপর ছবি ‘উনিশে এপ্রিল’ (১৯৯৬), ‘দহন’(১৯৯৮), ‘অসুখ’(১৯৯৯), ‘উৎসব’(২০০০) বা অপর্না সেনের ‘পারমিতার একদিন’ (২০০০) বা অঞ্জন দাসের ‘সাঁঝবাতির রূপকথারা’(২০০২) সমান্তরাল ছবির এই ধারণা তৈরি করে।

অনেকেই বলতে পারেন একটা সমান্তরাল ছবির ধারা তো পশ্চিম বাংলায় আগেই ছিল। ঠিকই,তবে সত্তর বা আশির দশকে সমান্তরাল ছবি নির্মাণের রাজনীতি ও নান্দনিক গড়ন একেবারেই অন্যরকম ছিল। মৈনাক বিশ্বাস তাঁর লেখায় মনে করাচ্ছেন কিভাবে এইসময়ে ‘সিনেমা অফ কনসার্ন’ জন্ম নিচ্ছে এক ধরনের রাজনৈতিক ছবির অবসানের পটভূমিতে। ছবিগুলোর দিকে ফিরে দেখলেই আমরা বুঝতে পারব কিভাবে এই সমান্তরাল ছবির ভাষা তৈরী হয়েছিল মধ্যবিত্ত বাঙালি ড্রইয়িং রুমকে ক্লোস-আপ ও মিড ক্লোস-আপের বিভিন্ন বিন্যাসে সাজিয়ে। ন্যারেটিভের ঝোঁকটা ছিল সম্পর্কের গল্প বলায়। ‘কলকাতা ৭১’ (মৃণাল সেন, ১৯৭২), ‘দখল’ (গৌতম ঘোষ, ১৯৮৪) বা ‘গৃহযুদ্ধ’ (বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, ১৯৮৪)-এর যে সমান্তরাল ছবির ধারণা ছিল, তার পরিবর্তে স্পষ্টতই এক অন্য ছাঁচ আসে ছবির ধারায়। নতুন একদল প্রযোজক-পরিচালক ও সমান্তরাল ছবির বাজার সম্পর্কে তাঁদের ধারণা নব্বই-পরবর্তী নব্য সমান্তরালের জন্য অনেকটাই দায়ী। সে কথায় খানিক পরে আসছি, তার আগে এই সমান্তরাল ছবির ভাষার ও তাদের বিশেষ কিছু ভঙ্গিমার দিকে মনোযোগ দেওয়া যাক। বাজার বা প্রযোজনার অঙ্কগুলো সরিয়ে রাখলে আর কোন দিক থেকে ‘নতুন’ এই সমান্তরাল ছবির

দুনিয়া? নানা ভাবেই এর উত্তর দেওয়া সম্ভব। কিন্তু ফিরে দেখলে মনে হয় এই ছবির জগত জুড়ে এক অতীতচারিতা ও অতীতচারণার রাজনীতি ছবিগুলোর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। কীভাবে এই অতীতচারণা আসে? একটু ফিরে দেখা যাক।

ঋতুপর্ণ ঘোষ প্রথম যে ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন তার নাম 'হীরের আংটি' (১৯৯৪), চিল্ড্রেন'স ফিল্ম সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ার প্রযোজনায়। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে ছবির গল্প এগোলেও ঋতুপর্ণ সচেতন ভাবেই যেন ছবিতে নিয়ে আসেন প্রবাসী নস্টালজিয়ার স্বাদ। ছবিতে আক্ষরিক অর্থে শুধু মেজ ছেলে ও তাঁর পরিবার প্রবাসী হলেও গোটা ছবি জুড়েই প্রবাসী বাঙালির দেশে ফেরার, ঘরে ফেরার রোমান্স। এক গোপন পারিবারিক অতীত, যা জানেন শুধু পরিবারের কর্তা; বাড়ির মালিকানা নিয়ে এক রহস্য ও ধীরে ধীরে তার জট খোলা, অন্যদিকে রূপকথার চরিত্রদের মত শ্বেত-লোহিত ও গন্ধর্ব কুমার – এসব নিয়েই 'হীরের আংটি'। ছবির গল্প, ও বিশেষত তার ক্লাইম্যাক্স, যেন ছোটবেলায় ফেরার একটা সুযোগ করে দেয় । আর সবটা মিলিয়ে ছবিটা যতটা না প্রথাগত ভাবে ছোটদের ছবি, তার চেয়ে অনেক বেশী বড়দের ছোটবেলায় ফেরবার ছবি। ঋতুপর্ণ ঘোষের 'হীরের আংটি' যদি ছোটবেলায় ফেরবার ইচ্ছেপূরণ হয়, কাছাকাছি সময়ে মুক্তিপ্রাপ্ত বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের 'লাল দরজা' (১৯৯৭) ছোটবেলায় ফিরতে না পারার যন্ত্রণা ও অসহায়তা নিয়ে বড়দের (এ সার্টিফিকেট নিয়ে মুক্তিপ্রাপ্ত) ছবি। ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্র ডেন্টিস্ট নবীন দত্তকে গ্রাস করেছে অশক্ত

ও পঙ্গু হয়ে যাওয়ার ভয় । তাঁর শারীরিক, মানসিক, আত্মিক পঙ্গুত্বের ভয় ও অসহায়তার বিপ্রতীপে আসে তাঁর ছোটবেলার স্মৃতি। এবং ছবির ফ্ল্যাশব্যাকে বালক নবীন দত্ত যেন এক রূপকথার কিশোর নায়ক যাঁর কাছে মন্ত্র রয়েছে বদ্ধ সব দরজা খুলে মুক্তির পথ বেছে নেওয়ার। বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের 'কালপুরুষ'এ (২০০৫) আবারও ছোটবেলার স্মৃতি ফিরে আসে ক্লিন্ন, মলিন বর্তমানের সমান্তরালে। এবং রাহুল বোস অভিনীত চরিত্রটি সেই ফেলে আসা অতীতের ছায়ায় নতুন করে আবিষ্কার করেন তাঁর বাবাকে।

বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের ছবিগুলি যদি গল্পের কেন্দ্রীয় পুরুষ চরিত্রদের মায়াময় ছায়াময় অতীতচারণার পাঠ হয়, ঋতুপর্ণ ঘোষের 'হীরের আংটি' পরবর্তী ছবিগুলোয় ফিরে ফিরে আসে কেন্দ্রীয় নারী চরিত্রদের স্মৃতির অনুভবী বিশ্ব। ঋতুপর্ণ ঘোষের 'উনিশে এপ্রিল' (১৯৯৬)-এ মা ও মেয়ের সম্পর্কের গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে সরোজিনী ও মিঠুর (অভিনয়ে অপর্ণা সেন-দেবশ্রী রায়) এক অতীতচারণা। উনিশে এপ্রিল মিঠুর বাবার মৃত্যুদিন; আবার এই দিনেই ওঁর মা সরোজিনী পুরস্কৃত হয়েছেন এক বিশেষ সম্মানে। গোটা ছবি জুড়ে সরোজিনীর পুরস্কার পাওয়ার সেলিব্রেশনের পাশাপাশি আসে মিঠুর স্মৃতিচারণা আর সেই সূত্র ধরে সরোজিনীর প্রতি অভিযোগ। ছবির শেষ অংশে এই স্মৃতিচারণা ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্নতা থেকে সরে এসে পারস্পরিক হয়েই অবসান ঘটায় অনেক ভুল বোঝাবুঝির । ঋতুপর্ণ ঘোষের 'অসুখ' (১৯৯৮) আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায় মা-মেয়ের যৌথ স্মৃতিযাপন। একটি দৃশ্যে অসুস্থ মা (গৌরি ঘোষ) আর পেশাগত ও ব্যক্তিগত জীবনে নানা দ্বিধা,

দ্বন্দ বিপর্যস্ত মেয়ে (দেবশ্রী রায়) আশ্রয় ও শুশ্রূষা পায় তাঁদের যৌথ স্মৃতিচারণ ও সঞ্চয়িতার পাঠে। অতীতচারণার এই নান্দনিক দিক ঋতুপর্ণ ঘোষের ছবিগুলোর হাত ধরে তাঁর অঁতরশিপের চিহ্নক হয়ে ওঠে নব্বই ও শূন্য দশকের কাজগুলোয় । তাঁর ছবির অতীতচারণার এই ধারাকে অনেকেই বলতে পারেন ঋতুপর্ণীয় বা ঋতুপর্ণয়েস্ক । কিন্তু এই নস্টালজিয়াময় ছবির জগত শুধু ঋতুপর্ণ ঘোষের একার নয়। অপর্ণা সেন থেকে অঞ্জন দাস এমনকি গৌতম ঘোষও নিয়ে আসেন ছবির চরিত্রদের অতীতচারণায় বিস্তৃত এক জগত।

'পারমিতার একদিন' (২০০০)এর কথা ধরা যাক। ছবিটি এক নিবিড় বন্ধুত্বের/সম্পর্কের কথা বলে যা গড়ে উঠেছিল পারমিতা (ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত) ও ওঁর প্রাক্তন শাশুড়ি সনকার (অপর্না সেন) মধ্যে। ছবি শুরুই হয় উত্তর কলকাতার পুরোনো এক বাড়ির শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের আয়োজনে। সেই বাড়ির উঠোন-জানলা-সিঁড়ি আর তার মধ্যে খেলে যাওয়া দুপুরের আলো-ছায়া আর তার সমান্তরালে ফেলে আসা সময় ও সম্পর্কের স্মৃতিময় হয়ে ওঠা। সদ্য প্রয়াত সনকার শ্রাদ্ধে এসেছেন পারমিতা এবং এরপর গোটা ছবিতেই ফ্ল্যাশব্যাকে ফ্ল্যাশব্যাকে অতীত সময়, ঘটনা ও চরিত্রদের ধরে অপর্না সেনের চিত্রনাট্য ও অভীক মুখোপাধ্যায়ের ক্যামেরা। অঞ্জন দাসের 'সাঁঝবাতির রূপকথারা'(২০০২-তে আবার কেন্দ্রীয় চরিত্রের স্মৃতি, স্বপ্ন ও কল্পনা মিলেমিশে যায় এক সঙ্গে। এই ছবিগুলিতে নস্টালজিয়া অবশ্যই একটা বিশেষ নান্দনিকতা নিয়ে আসে, কিন্তু আমার মতে এই অতীতচারণার আর এক জরুরি দিক হল তার রাজনীতি । একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে কিভাবে

এই চরিত্রের স্মৃতিচারণ বা অতীতের ঘটনা বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে নিয়ে আসে এক সামাজিক বা সাংস্কৃতিক অতীতের অনুষঙ্গ । ঋতুপর্ণ ঘোষের 'হীরের আংটি' বা 'উৎসব' সচেতন ভাবে নিয়ে আসে সত্যজিৎ রায়ের 'জয় বাবা ফেলুনাথ'(১৯৭৯) এর স্মৃতি। গৌতম ঘোষের 'আবার অরণ্যে'(২০০৩) একরকম ভাবে ফিরে দেখে সত্যজিৎ রায়ের 'অরণ্যের দিনরাত্রি' (১৯৭০)-কে, যেখানে চরিত্রের অতীত, গল্পের অতীত আর দর্শকের অতীত এক হয়ে যায়। সমসময়ের প্রেক্ষাপটে কিভাবে দেখা যেতে পারে এই অতীতচারণা? কিছুটা উত্তর পাওয়া যাবে সমসময়ের বাংলা ছবি প্রযোজনার পরিপ্রেক্ষিতে এই নির্মাণগুলো দেখলে।

আশির দশকের শুরুতে বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে আগমন হয় নতুন একদল প্রযোজক ও পরিচালকদের আর নানা রকম নতুনত্বের আমদানি হয় এঁদের হাত ধরে। বাংলা চলচ্চিত্রে আশির দশক এমন এক সময় যখন বাংলা ছবির নায়কের শ্রেণী অবস্থান থেকে, হিরো–হিরোইনদের শরীরী উপস্থিতি ও অভিনয়, ছবির গানের কথা-সুর-ছন্দ সবই বদলে যেতে থাকে খুব দ্রুত । এই পরিবর্তনের নেপথ্য কারণ হিসেবে সমসাময়িক চলচ্চিত্রকার ও প্রযোজকরা যেটা বলছিলেন তা হল বাণিজ্যের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাংলা ছবির টিকে থাকা নিশ্চিত করতেই তাঁরা বাধ্য হয়েছিলেন ছবির 'ফর্মুলায়' বদল আনতে। চলচ্চিত্রকার স্বপন সাহা বা হরনাথ চক্রবর্তীর মতে আশির দশক এটা বুঝিয়ে দ্যায় টি.ভি./ ভি. সি. আর./ভিডিওতে বিনোদন খুঁজে নেওয়া শহরের 'শিক্ষিত' মধ্যবিত্তরা আর সিনেমা হলে যাবেন না। গেলেও তাঁদের সংখ্যা খুব কম। মোদ্দা কথা তাঁরা আর পপুলার

ছবির 'টার্গেট অডিয়েন্স' নন। তাই বাংলা ছবিকে পৌঁছতে হবে শহরের শ্রমিক শ্রেণীর কাছে। অতএব তাঁদের চেষ্টা ছিল এই বাজার ও রুচির কাছে পৌছোনোর। এরই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য হল, কলকাতার কিছু সিনেমা-হল মালিকও জানাচ্ছেন যে আশির দশকে বাংলা ছবির দর্শক শ্রেণীর একটা পরিবর্তন আসে। ঐতিহাসিক পরিমল ঘোষের গবেষণা ধার করে নিয়ে এটাও মনে রাখার যে কলকাতা শহর ও তার সংলগ্ন এলাকা এই সময় শ্রমিক শ্রেণীর এক নতুন বিন্যাস দেখে। রেলওয়ের যোগাযোগের বিস্তার, দেশের নতুন অর্থনীতির মডেল ও আরো নানান কারণে নীল-কলার শ্রমিকেরা (একা বা পরিবার সঙ্গে নিয়ে) অনেক বেশি সংখ্যায় কলকাতা আসতে ও থাকতে শুরু করেন। ফলে কলকাতা শহরের রাস্তাঘাট থেকে বাজার এলাকা, বাণিজ্য কিংবা বিনোদন ইত্যাদি অনেক কিছুই শ্রেণি বৈচিত্র্যের প্রেক্ষিতে আগের থেকে বেশি 'ইনক্লুসিভ' হয়ে ওঠে। আশির দশকের বাংলা চলচ্চিত্র জগতের নতুন বাংলা ছবি, সেই ছবির কারিগর ও তাদের 'টার্গেট অডিয়েন্স'রা হয়ে ওঠেন এই পরিবর্তিত সময়েরই প্রতিনিধি-স্বরূপ।

এই নতুনত্বের আমদানিতে আহত হয় বাংলা চলচ্চিত্রে পাঁচ দশক ধরে চলে আসা ভদ্রলোক শ্রেণীর কর্তৃত্ব। ভদ্রলোক-রুচি অভিযোগ আনে বাংলা ছবিতে স্থূলরুচির প্রাচুর্যের! ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির পুরনো পরিচালক ও কলাকুশলীরা অখুশি হতে থাকেন নতুনদের কাজে। আর পত্র পত্রিকার পাতায় সাংবাদিক ও শহুরে মধ্যবিত্ত দর্শকের একাংশ আক্রমণ করতে শুরু করেন এই বদলে যাওয়া চলচ্চিত্র জগতকে। যেটা গুরুত্বপূর্ণ, বাংলা ছবির এই আলোচনায় প্রধান জায়গা নেয় হারানো বাংলা ছবির

‘গৌরব জনক অতীত’। আশি ও নববই দশকের বাংলা চলচ্চিত্র এই ‘নতুন ওরা’ বনাম ‘পুরনো আমরা’ দুটো শ্রেণীরও লড়াই। তাই নতুন চলচ্চিত্রের রুচি ও চলচ্চিত্র নির্মাতাদের নিয়ে ভদ্রলোকদের ভয় ও সঙ্কট এতটাই। একদিকে বাংলা ছবি নিয়ে আলোচনায় বাড়তে থাকে দীর্ঘশ্বাস – সঙ্কট, অবক্ষয়, অবনতির মত শব্দদের উপস্থিতি! অন্যদিকে এক আদর্শ ছবির ধারণায় দেখা হতে থাকে উত্তম-সুচিত্রার পঞ্চাশ-ষাটের দশকের কাজগুলি ও সত্যজিৎ রায়ের কালজয়ী অপু ট্রিলজি বা অন্যান্য ছবি। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল, পঞ্চাশ এবং ষাটের দশক ব্যাপী বাংলা ছবির যে সুবর্ণ যুগের কল্পনার সঙ্গে আমরা পরিচিত তার অনেকটাই কিন্তু এই আশি-নব্বই দশক ও তার পরবর্তী ভদ্রলোক নস্টালজিয়ার নির্মাণ। পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে সমসাময়িক আলোচনায় উত্তম-সুচিত্রার অনেক ছবিই নিন্দিত। ছবির প্লট সমালোচিত কারণ তাতে নাকি যথেষ্ট নীতি-নৈতিকতা নেই! সুচিত্রা সেনকে শুনতে হচ্ছে তাঁর অভিনয় অতিরেক দোষে দুষ্ট এবং এটাও ঘটনা যে সিনেমা ঘরের পর্দা জুড়ে উত্তম-সুচিত্রা জুটি আলো করে থাকলেও হিসেবের খাতা বলছে ১৯৬৭ বা ১৯৬৮ এর বাংলা ছবির বাক্স দপ্তরে ‘হারানো সুর’ বা ‘সাগরিকার’ জুটির ম্যাজিক স্তিমিত।

উনিশশো আশিতে উত্তম কুমারের মৃত্যুর পর আশির দশকের গোড়া থেকে মাঝামাঝি অবধি পরপর বাংলা চলচ্চিত্রের অনেক নামী পরিচালক অবসর নেন ও প্রয়াত হন, আবার কেউ কেউ বম্বে চলে যান বা হিন্দি চলচ্চিত্র জগতে যোগ দেন । সুচিত্রা সেনের অবসরও অন্যতম একটি পরিবর্তন। এরপর উনিশশো

বিরানব্বই-এ সত্যজিৎ রায়ের প্রয়াণ সামগ্রিকভাবে বাংলা চলচ্চিত্রের একটি যুগের অবসান চিহ্নিত করে দেয়। এবং একই সঙ্গে নস্টালজিয়ার ব্র্যাকেটে বন্দী হয় বাংলা ছবির হারানো এক অতীত। ‘স্থূলরুচির’ বাংলা ছবিতে ভদ্রলোক রুচির পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করতে থাকে বাংলা সিনেমার সেকাল ও একালের তুলনামূলক আখ্যান। পত্র-পত্রিকার পাতায় সাংবাদিক ও দর্শকদের আলোচনা ও অতীতচারণা ‘ভালো বাংলা ছবি’র এক ধারণা নিয়ে আসে। নব্বই এর নব্য ‘সমান্তরাল’ ছবি সেই ধারণাকেই আত্মস্থ করে বাংলা ছবিতে ‘ভদ্রলোক’-রুচির পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হয়। এই যোগসূত্র আরেকটু বিস্তারিত হবে ছবি প্রযোজনার অঙ্কগুলো দেখলে।

যাঁরা এই ছবিগুলোর প্রযোজনা করেছিলেন তাঁরা মনে করেছিলেন ‘স্থূলরুচির ফর্মূলা ছবিতে’ বাজার ছেয়ে গেলেও ‘ভালো গল্পের পরিশীলিত নির্মাণ’ দেখতে চান এরকম একটা ভদ্রলোক দর্শকের বাজারও রয়েছে। কেননা পপুলার বাংলা ছবি নিয়ে বিরক্ত একটি দর্শক শ্রেণী রয়েছে যার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে পত্র-পত্রিকার পাতায়। দ্বিতীয়ত তাঁরা এও ভেবেছিলেন ছোট পুঁজি নিয়ে এগোলে ‘কম রিস্ক’ নিয়ে অল্প মার্জিনে লাভ হতেই পারে। কিন্তু সমান্তরাল এই বাজারের শর্ত হল এই ছবিগুলোকে নিয়ে আসতে হবে হারানো বাংলা ছবির স্বাদ- বাংলা সাহিত্য অবলম্বনে ভালো গল্প, ‘সুস্থ রুচি’ (পপুলার ছবির নাচ-গান/ অন্যান্য মশলা বর্জিত) আর উচ্চকিত মেলোড্রামার বদলে সংলাপে, অভিনয়ে পরিমিত পরিশীলিত নির্মাণ। ছবিগুলোর নান্দনিক দিক এবার যদি আমরা ভেবে দেখি, বুঝতে পারব কিভাবে নব্বই-এর নব্য, শহুরে ‘সমান্তরাল’ ছবিতে এই শর্ত পূরন করেছেন চলচ্চিত্র

নির্মাতারা। আসলে প্রযোজক থেকে পরিচালক সকলেই চাইছিলেন হারিয়ে যাওয়া বাংলা ছবির স্বাদ নিয়ে আসুক এই সমান্তরাল ছবির দুনিয়া। প্রসঙ্গত, 'উনিশে এপ্রিল (১৯৯৬) প্রযোজনার জন্যে তৈরি হয় 'স্পন্দন ফিল্মস'। ছবির অভিনেত্রী অপর্ণা সেন ঋতুপর্ণ ঘোষের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন ক্যালকাটা ক্লাবের প্লেসিডেন্ট রেণু রায়ের। রেণু রায় ছবিটির প্রযোজনা করবেন স্থির করেন কারণ তাঁর মনে হয়, এক ধরনের 'ভালো বাংলা ছবি' (যেরকম আগে হত) হওয়া খুব দরকার। রেণু রায় তাঁর সাক্ষাৎকারে বলেছেন খুব অল্প বাজেটে শেষ করা হয় ছবির কাজ। আটটি প্রিন্ট নিয়ে কলকাতার মিনার-বিজলি-ছবিঘর চেনে মুক্তি পায় ছবিটি আর রিলিজের প্রথম সপ্তাহেই জানা যায় এ ছবি হিট। আরো একটি উদাহরণ হিসেবে 'দীপ ফিল্মসে'র কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ন্যাশনাল অ্যাডভার্টাইসিং এজেন্সির মালিক সন্দীপ সেন নব্বইএর দশকের শেষ দিকে ছবি প্রযোজনা শুরু করেন দীপ ফিল্মসের ব্যানারে। সন্দীপ সেন তাঁর সাক্ষাৎকারে বলেন যে,তাঁরা স্থির করেছিলেন অল্প কিছু প্রিন্ট নিয়ে সীমিত কিছু সিনেমাহলে চালাবেন এই ছবিগুলি। তাই তাঁদের কারোরই আফসোস হয়নি বড় চেনে ছবি রিলিজ করতে না পেরে। রেণু রায় বা সন্দীপ সেনের মত প্রযোজকরা জানিয়েছেন যে এই ছবিগুলোর নির্মাণের সময় থেকেই তাঁদের স্পষ্ট ধারনা ছিল এইসব ছবি 'মাস দর্শকদের নয়, নিশ দর্শকেদের'। ওঁরা জানতেন বড় চেনের বাংলা ছবির ফর্মুলা রোমান্স আর মারপিটের ছবি দেখে দেখে একশ্রেণীর দর্শক বিরক্ত এবং তাঁরা অপেক্ষা করে রয়েছেন অন্য রকম বাংলা ছবির জন্য। এই প্রযোজকদের

এও দাবি যে তাঁদের এই অনুমানে ভুল ছিল না। মুক্তির আগেই এই ছবিগুলো নিয়ে আগ্রহ তৈরি হয়। ছবিগুলোর শহরকেন্দ্রিক সীমিত বাণিজ্য/বাজারের মধ্যেই 'সুস্থ রুচি'র সমান্তরাল বাংলা ছবির একটি মডেল নিয়ে আসে 'উনিশে এপ্রিল' (১৯৯৬) বা 'সাঁঝবাতির রূপকথা'রা (২০০২)।

এভাবে ছবি প্রযোজনার অঙ্কেও 'ভালো বাংলা ছবি' ও তার 'রুচিশীল বাঙালী দর্শক' দুই-এরই পুনরুদ্ধার গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। ঋতুপর্ণ ঘোষ বা অঞ্জন দাসের মত চলচ্চিত্র নির্মাতারাও স্বীকার করেছেন তাঁদের জনপ্রিয়তার পেছনে ছিল এই হারানো বাংলা ছবির জগত ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারার বিশেষত্ব। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল, ছবিটি যে গড়পড়তা মূলধারার চেয়ে আলাদা, তার প্রচার, বিপণন ও বিজ্ঞাপন কৌশল। ভালো রিভিউ-এর পাশাপাশি এ প্রচারের অন্যতম দিক ছিল এই ছবিগুলোকে বাংলা সিনেমার সেকাল ও একালের তুলনামূলক আখ্যানে ভদ্রলোক রুচির পুরনো বাংলা ছবির উত্তরসূরি হিসেবে দেখা ও এই পরিচালকদেরও সেই স্বীকৃতি দেওয়া। ফলে সংবাদপত্র ও পত্রিকার পাতায় এই ছবি গুলোর আলোচনার কেন্দ্রেও নজরে পড়বে বিশেষ কিছু ভঙ্গিমা। ঋতুপর্ণ ঘোষ বা অঞ্জন দাসের ছবির রিভিউ করতে গিয়ে চলচ্চিত্র সমালোচকেরা প্রায়শই নিয়ে আসছেন অতীত চারণা ও 'ভালো বাংলা ছবি'র নস্টালজিয়া। নব্বই এর নব্য 'সমান্তরাল' ছবি তাঁর নির্মাণ, প্রচার, বিপণন ও বিজ্ঞাপন সবটা নিয়েই যেন ঘোষণা করে দেয় বাংলা ছবিতে ভদ্রলোক রুচির পুনরুদ্ধার। বৃত্ত সম্পূর্ন হয় ছবি আলোচনায় অতীতচারণা থেকে ছবির জগতের নস্টালজিক নির্মাণে।

জিগনা দেশাই-এর মত চলচ্চিত্র গবেষকরা জানাচ্ছেন নব্বই দশকে উদ্ভুত সাউথ এসিয়ান ডায়াস্পোরিক চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও নস্টালজিয়া ও নতুন বাজারের প্রশ্ন খুব গুরুত্বপূর্ণ। নব্বই-এর গোড়ায় মীরা নায়ারের 'মিসিসিপি মসালা' (১৯৯১) বা পরের দিকে কাইজাদ গুস্তাদের 'বম্বে বয়েজ' (১৯৯৮) বা নাগেশ কুকুনুরের 'হায়দেরাবাদ ব্লুজ' (১৯৯৮) এক ধরণের প্রবাসী নস্টালজিক ছবির স্বাদ নিয়ে আসে যা আবার একেবারেই বলিউডিও আদিত্য চোপড়া – সুভাষ ঘাইএর আদলে নির্মিত আদর্শ দেশ ও দেশজ সংস্কৃতির পিছুটান নয়। 'মিসিসিপি মসালা'র মধ্যবয়স্ক জয় বা 'বম্বে বয়েজ' এর তিনটি যুবক দেশ বা হারিয়ে যাওয়া এক সময়ে ফিরতে চাইলেও বর্তমান ও বহমান জীবনের জটিলতায় অনুধাবন করে দেশের সঙ্গে তাঁদের অসেতুসম্ভব দূরত্ব। কিন্তু এক অস্থির ও বিষণ্ণ সময়ের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে এই পিছুটানকে উপেক্ষাও করতে পারেন না তাঁরা । সমসময়ের চলচ্চিত্র সংস্কৃতির এই গ্লোবাল/ লোকাল সমীকরণের আলোয় নব্বই-পরবর্তী বাংলা ছবির অতীতচারণাকে কিভাবে দেখতে পারি আমরা? বলিউড বা সাউথ এসিয়ান ডায়াস্পোরিক চলচ্চিত্রের মত প্রবাসী দর্শকের বাজার অতটা গুরুত্বপূর্ণ না হলেও ২০০০ পরবর্তী সময়ে বাজারের কিছু নতুন সম্ভাবনা ও সমীকরণ এই নব্য সমান্তরাল বাংলা ছবিতেও এসেছিল। ঋতুপর্ণ ঘোষের 'উৎসব' এখানে বিশেষভাবে আলোচনার দাবী রাখে।

যাঁরা 'উৎসব' দেখেছেন তাঁরা জানবেন কিভাবে শুরুর দৃশ্য থেকে একের পর এক ফ্রেম জুড়ে একধরনের বাঙালী নস্টালজিয়া আর তার ইচ্ছেপূরণের গল্প বলে

ছবিটি। ব্যাক্তিগত অতীত থেকে পারিবারিক অতীত আবার পারিবারিক অতীত থেকে সামাজিক-সাংস্কৃতিক অতীতকে এক সুতোয় বেঁধে ফেলতে চান ঋতুপর্ণ। আর তাঁর অবলম্বন এক বনেদী বাঙালি পরিবারের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কিছু সদস্য যাঁরা একত্রিত হয়েছেন দুর্গাপূজোর ছুটিতে। ছবি যত এগোয়, দেখা যায় কিভাবে একদিকে যেমন চরিত্ররা নিজেদের সম্পর্কগুলো আবিষ্কার করতে করতে ফিরে আসতে থাকেন নিজেদের শেকড়ে, অন্যদিকে একচালা প্রতিমার সাবেকী সাজ থেকে সত্যজিৎ রায়- সুকুমার সেনের অনুষঙ্গে পরিচালক দর্শকদেরও নিয়ে যান এক নস্টালজিয়া ট্যুরে। 'উৎসব'-এর প্রযোজক তপন বিশ্বাস বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে ১৯৮১ সাল থেকে যুক্ত। ১৯৯৯ সালে ঋতুপর্ণ ঘোষের সঙ্গে তাঁর আলাপের পরেই উনি পরিকল্পনা করেন উত্তর আমেরিকার বঙ্গ সম্মেলনে ঋতুপর্ণ ঘোষের ছবির একটি রেট্রোস্পেক্টিভের। বঙ্গ সম্মেলনে 'উনিশে এপ্রিল' ও 'দহন'-এর সাফল্য দেখে পরিকল্পনা হয় আমেরিকাতেই একটি ছবি প্রিমিয়ার করার। সেই মতই 'উৎসব'এর প্রযোজনার কাজ চলে। পরিকল্পনা মতই লস এঞ্জেলসের জেনেরাল সিনেমায় প্রিমিয়ার সহ আমেরিকার আরো নানা জায়গায় ছবিটি দেখিয়ে ভালো আয়ও হয়। সেই সাফল্যে বিশ্বাসবাবু ভাবতে থাকেন কেমন হয় যদি উত্তর আমেরিকায় প্রতি বছর দুটো করে বাংলা ছবি মুক্তির পরিকল্পনা করা যায়। সেই মত কথাও এগোয়, কিন্তু নানা অসুবিধের কারণে এই পরিকল্পনা আর বাস্তবায়িত হয়না। এই ক্ষেত্রে 'ডায়াস্পোরা' বাজার সেভাবে সাড়া না দিলেও 'উৎসব' এর পথ ধরে এগিয়ে এর পরেই উত্তর আমেরিকায় এই ধরনের বাংলা ছবি দেখানোর জন্য

বেশ কিছু ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এগিয়ে আসতে থাকে।' ডেটা বাজার মিডিয়া ভেঞ্চার 'বা 'ভিন্ন মত নিউজ নেটওয়ার্ক'-এর মত বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে বাংলা ছবির অনলাইন বাণিজ্যও বিস্তৃত হয় একে একে। আর এই প্রবাসী বাজারের কথা ভেবেই যেন 'পিয়ালীর পাসওয়ার্ড' বা 'বং কানেকশন'এর মত বাংলা ছবিগুলো সচেতন ভাবে ডায়াস্পোরিক চরিত্র ও তাঁদের অতীতচারণার গল্প নিয়ে আসতে থাকে।

কিন্তু এটাও ঠিক যে বাংলা ছবিতে অতীতচারণা ও ছবির জগতের নস্টালজিক নির্মাণের এই এক বগ্‌গা ধরন খুব বেশি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ২০০০ সালের পর কর্পোরেট প্রযোজনার নানা অঙ্ক ঢুকে পড়ে বাংলা ছবিতে। বাজারের বিন্যাস ঘটে নতুন নিয়মে, বদলে যায় ছবি প্রযোজনা-পরিচালনা, ডিস্ট্রিবিউশন-এক্সিবিশন ও বিপণন- বিজ্ঞাপনের আন্তঃসম্পর্ক। মহেন্দ্র সোনি ও শ্রীকান্ত মোহতা নব্বই-এর দশকে পূর্ব ভারতে মূল ধারার হিন্দি ছবির ডিস্ট্রিবিউটর হিসেবে পথ চলা শুরু করে ক্রমে ক্রমে বাংলা ছবির বাজারে নিজেদের আসন পাকা করতে থাকেন। ওঁদের মালিকানায় শ্রী ভেঙ্কটেশ ফিল্মস (এস. ভি. এফ) হয়ে ওঠে মূলধারার বাংলা ছবির 'সফলতম' প্রযোজনা সংস্থা এবং বাংলা ছবির বাজারের নিয়ন্ত্রকও। বেশ কিছু গড়পরতা মূলধারার ছবির প্রযোজনার পর ঋতুপর্ণ ঘোষের 'চোখের বালি' (২০০৩) এস. ভি. এফ-এর কর্পোরেট পুঁজির বাণিজ্যে এক বড় মাপের সাফল্য। অন্যান্য নানা বদলের সঙ্গে সঙ্গে কর্পোরেট হাওয়ায় মূলধারা ও সমান্তরাল ছবির এই বিভাজনের রেখাগুলোই অস্পষ্ট হয়ে যেতে থাকে ক্রমশ।

নতুন পরিচালকদের হাত ধরে অতীত চারণার রাজনীতিও নতুন রূপ নিতে থাকে। সুমন মুখোপাধ্যায়ের ‘হারবার্ট’ (২০০৫) নস্টালজিক ‘ভদ্রলোক’ ছবির ধারণাকেই ভেঙেচুরে নিয়ে আসে অতীতের এক অন্য পাঠ – যেই অতীত বিপ্লবের, হিংসার, রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়ন আর তার থেকে মুক্তির লড়াই-এর। ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির মত সেই অতীত যেকোনো মুহুর্তে ফেটে পড়তে পারে! একদিকে প্রতিষ্ঠিত পরিচালকেরা অতীতচারণার চেনা কাঠামোয় প্রায়-আত্মজীবনীধর্মী ছবি বানাতে থাকেন- যেমন ‘ইতি মৃণালিনী’ (অপর্ণা সেন, ২০১১), ‘দত্ত ভার্সেস দত্ত’ (অঞ্জন দত্ত, ২০১২) বা ‘চিত্রাঙ্গদা’ (ঋতুপর্ন ঘোষ, ২০১২); অন্যদিকে নতুন পরিচালক সৃজিত মুখার্জি বা অভীক মুখোপাধ্যায় তাঁদের ছবির অতীতচারণার মধ্যে খুঁজে পান বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসের অন্য একটি দিক- অপরাধ! সৃজিত মুখার্জির ‘বাইশে শ্রাবণ’ (২০১২) বা অভীক মুখোপাধ্যায়ের ‘একটি তারার খোঁজে’ (২০১০) বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস থেকে খুঁজে নেয় স্টোনম্যান রহস্য বা ঠগিদের বিবরণ আর ছবিতে নিয়ে আসেন এই অপরাধের জগতের অতীত। এভাবেই অতীতচারণার গল্পগুলো বদলায় আর বাংলা ছবিতে নতুন নতুন নজির নিয়ে আসে। কিন্তু সে কথা না হয় আরেকদিন হবে।

সূত্রঃ

- মৈনাক বিশ্বাস, "রে অ্যান্ড দ্য শ্যাডো অফ পলিটিকাল সিনেমা" মার্গ, ১লা মার্চ, ২০১০।
- সোমেশ্বর ভৌমিক, ভারতীয় চলচ্চিত্রঃ একটি অর্থনৈতিক প্রতিবেদন, প্যাপিরাস, ১৯৯৬।
- অনিল আচার্য, সত্তর দশক, অনুষ্টুপ, ১৯৮১।
- পরিমল ঘোষ, "হোয়ার হ্যাভ অল দ্য 'ভদ্রলোকস গন", ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিকাল উইকলী, ২৭শে জানুয়ারি, ২০০৪।
- জিগনা দেশাই, বিয়ন্ড বলিউডঃ দ্য কালচারাল পলিটিক্স অফ সাউথ এসিয়ান ডায়াস্পোরিক ফিল্ম, রুটলেজ, ২০০৪।
- অনুজ্ঞান নাগ, "ফ্রম টলিগঞ্জ টু টলিউডঃ দ্য ট্রানসফরমেশন অফ বেঙ্গলি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি বিটুইন নাইনটিন এইট্টী অ্যান্ড দ্য প্রেসেন্ট", জার্নাল অফ বেঙ্গলি স্টাডিস, ২০১১, বর্ষ ১, সংখ্যা ২।

****

Woman Interrupted: A Gender Discourse On 90'S India

Senjuti Patra

Illustration: Suman Mukherjee

"*She is single, has a career and is willing to have fun, take risks and find a man her way, which is not necessarily her family's way.* – It is a woman we have read about in books from the Western countries, and now suddenly we are finding her on Indian roads." (Lakshmi, 2007).

It was the decade of heady optimism. All around the world, old ideas of feminism were being torn apart, questioned, reimagined, and in the process, making way for a new order of things. And in 1991, when India opened up its economic frontiers, this wave of global optimism swept us up right alongside it. When we look at this decade today, all that stares back at us is the face of the "newly liberated" working woman, with her rose-tinted vision and the avatar she has been granted by popular culture in the years since. But when we scratch the glitter, what do we find?

The Advent of Advertising

Television was introduced in India through the state controlled Doordarshan in 1959, and was restricted to "educational" programmes until 1982, when the National Programme introduced entertainment programmes. This was part of the government's

project of modernization that would “lead India into the twenty-first century”. The impetus provided by the improvement in broadcast technology, introduction of colour television, and an active effort to restructure programming were reflected in the sharp increase in the sales of television sets, from 5 million in 1985 to 35 million in 1990. By 1992, the reach of television had expanded to include 80% of the population. Television established itself as an invaluable medium for the creation of social and cultural hegemonies, and the most crucial facilitator of the shift of economic focus from capital goods investment to consumerism.

Hum Log, the first dramatic television serial to be produced in India and broadcast on Doordarshan in 1984-85, was conceived along the lines of a Mexican telenovela, with the ostensible aim of encouraging family planning. The production of this hugely popular serial, and that of other narrative serials to come, were enabled by the introduction of a commercial sponsorship scheme that allowed corporations to cover the production costs of a show in exchange of ninety seconds of advertisement time. The lucrativeness of this scheme for sellers of products is epitomised by the success of Maggi noodles after FSL started sponsoring Hum Log. Unlike current

television formats, the advertisements then did not interrupt the narrative flow of a programme and were clustered at the beginning. After FSL started sponsoring Hum Log, the Maggi noodles commercial occupied the crucial few seconds before the beginning of an episode when it had access to a large captive audience. The sales of Maggi noodles increased more than three-fold in just one year, and made packaged food acceptable and attractive to the Indian middle class. The contribution of advertisements in not just selling specific products but manufacturing the aptitude to consume is evident in the fact that a major part of the 90's nostalgia ubiquitous on the internet today is composed of memories of advertisements and the products they sold.

Purnima Mankekar, in her book *Screening Culture, Viewing Politics,* analyses the way viewers interacted with the narratives portrayed on Doordarshan through an ethnographic study of lower middle class and upwardly mobile working-class households in Delhi. Her observations cast light upon the way television shaped gender, communal and national identities, set the stage for the tumultuous 90's and changed forever the approach to discourse on social and political reform. The products advertised on Doordarshan came to

symbolise middle-classness, and many of the households Mankekar interviewed saw the possession of these as essential to establish middle class status. The aspirations ignited and legitimised by advertisements stressed already precarious finances. The middle and lower middleclass households that were already entrenched in the dowry system, often sought to fulfil these aspirations through outrageous demands for dowry. Several of the people Mankekar interviewed saw a direct link between the proliferation of advertisements on television and increasingly elaborate demands for dowry, and the penetration of the dowry system into communities where it had not been historically prevalent. Refrigerators and scooters now joined jewellery and cash as dowry demand staples. Ironically, advertisements for consumer durables that drove this trend often framed serials with overt anti-dowry messages.

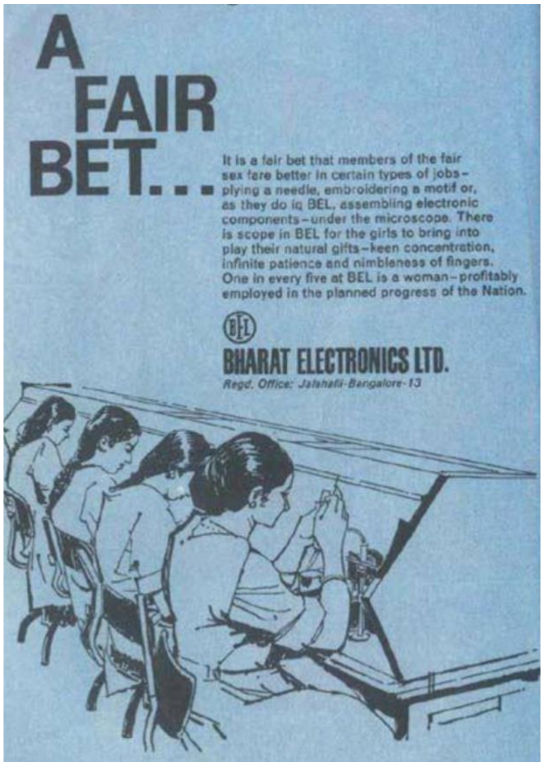

Adverstisements in print and Doordarshan alike showcase stereotypical gender identities hiding behind apparently progressive narratives

A Woman of the Nation

Though the introduction of commercial

sponsorship shifted the focus of Doordarshan to entertainment, these entertainment programmes had specific, state sponsored agendas. One of these was national integration, in the wake of the rise of secessionist movements in different parts of the country. The urgent need to create a national culture was the main motivation for the broadcasting of the National Programme in the first place. So, while viewers from one part of the country were exposed to the culture of another part by the dramatization of stories written and set in different parts of the country in *Ek Kahaani*, *Buniyaad*, *Yugantar* and others, the brutal excesses of the repression of secessionist movements remained excluded from television and largely from the consciousness of the middle class in the Hindi heartland. News bulletins on Doordarshan were also accused of devoting very little air-time to important news concerning opposition governments at the states. Another aim of the government was to broadcast programmes that would further the cause of emancipation of women, and the late 80s and early 90s saw a slew of "women-oriented" programmes that claimed to foreground women's experiences and problems. These programmes sought to inform women of the importance of hygiene and family planning, promoted education for women and featured assertive female

protagonists. The target audience of these programmes connected with these narratives. One of the women Mankekar interviewed recalled how the popular serial *Rajani* inspired her to confront the local milk delivery service that had started delaying deliveries, messing up the busy schedules of women in the area.

The "women-oriented" narratives, however, operated "within the system", and did not transcend the boundaries drawn by the hegemonic patriarchal culture keen on protecting the sanctity of the family and on seeing women as flagbearers of "Indian culture", modernising to better perform her role in the family and in the service of the nation while retaining all the glorious traditions of an ancient country. Kavita Choudhary, who wrote, directed and starred in *Udaan,* a popular serial about a woman IPS officer, spoke to Mankekar of the tradeoff that she had to face as a feminist as an activist, between the access to a large audience and the dilution in ideology mandated by this access. So, while Kalyani, the protagonist of Udaan, fought bandits and tried to reform a corrupt system, her father emerged as the true hero – as the facilitator of her success by allowing her the same opportunities as his son, and as her moral compass and dispenser of crucial advice. This phenomenon is echoed

in the recent movie *Thappad,* which has gained wide acclaim as a woman-oriented narrative, but I wonder if the makers of the movie had any of Kavita's awareness of the patriarchal framework that they had chosen to place their narratives in.

Another feature of these narratives against social evils was the treatment of women as an object of reform, "dowry-victims" who needed to be rescued by the state. This formulation effectively ignored the efforts of activists who had worked to empower women in various socio-political contexts. Women activists, when portrayed on television, were either bogged down by a relentless stream of woes resulting from their activism, or were rampaging hordes out to destroy the fabric of Indian culture and break up families. Thus, while to some extent women's independence was encouraged, women's collective action for social justice was either ignored or vilified – suppressing the contribution and potential of several grassroots movements and organisations that had worked tirelessly for empowerment of women and fought for equal rights and opportunities.

Growth of the Autonomous Women's Movement

The evolution of the women’s movement in India has been characterised by an acknowledgement of the existence of multiple schools of thought within it, and of the diverse needs of the constituency of women whom it sought to represent. Since pre-independence times, the movement had been closely linked with other democratic and radical movements, and by the 1990s, it was more sophisticated and self-aware than its “Western” counterparts. Indian feminists, since the inception of the movement, were anti-colonial and anti-imperialist, criticising western feminism for its inability to engage with other social justice movements long before intersectional feminism became woke. Women’s movements had often risen out of struggles for justice in other spheres – from militant peasants’ movements, from trade union movements and from the struggle for a safe environment. They were led spontaneously by women from disadvantaged communities, women workers and labourers, who, while fighting against the oppression of their communities, applied the same sense of social justice and freedom from oppression to identify and collectively resist their exploitation within their communities and families.

In the 1980s, the country saw a large-scale mobilisation of women against two major forms of violence against women in India – dowry murders and rape. The government was forced to take notice and amend legislation. While these amendments were inadequate in formulation and in implementation, the magnitude of the agitations drove home the political potential of the constituency of women. For the largely middle-class face of the movement, it underscored the importance of supporting individual women alongside continuing the agitation for changes in societal and legal frameworks. Several women's centres were established in different parts of the country, that provided health care, legal aid and counselling in an explicitly feminist framework. The new centres also sought to build a sisterhood of women across class and caste, drawing upon Indian traditions of female friendships. Saheli, a women's centre in Delhi, approached this though a workshop on song, dance, drama and painting for women from all over the country. This approach reinforced the possibility of joy and playfulness in exclusively women's spaces, and inverted hierarchies when middle class women learnt traditional song, dance and art forms from working-class or peasant women. Unlike the present, when Madhubani painting and Gond art can be appropriated by

Instagram artists without any acknowledgment of the lived experiences of the communities that have developed and kept these art forms alive, the knowledge of the rich and diverse cultural heritage of the country in the 80s came with an awareness of the different forms that oppression might take depending on the subject's position along axes of gender, caste, class and community.

In 1991, Giti Thadani founded Sakhi, a network for lesbians all over the country to communicate via letters. This expanded the access to community support beyond the circle of urban activists, and paved the way for the establishment of several other initiatives to provide platforms for lesbians to interact with and support one another. In 1998, upon the release of Deepa Mehta's *Fire* in India, lesbianism gained public

3. India's first known gay protest in 1992 outside of Delhi's police headquarters. The placard in the foreground reads: "Let homosexual people (*samlaingik log*) live with fulfillment (*chain se*)." Photograph by K. K. Laskar, courtesy of the Times Group.

spotlight as it was attacked for being "against Indian culture" while drawing large crowds to theatres. The lives of transwomen, however, continued to be precarious as they were excluded from spaces that were opening up due to globalisation in the late 80's and 90's. It would be more than a decade before conversations on transrights would gain traction in India.

The Politics of Division

As the women's movement focused increasingly on empowering individual women, the establishment of the political significance of the constituency of women led to the mainstream political parties co-opting the narratives of the women's movement. The individual women of the movement, and those that women's centres were working to empower, started to be pitted against the "real woman" variously defined by political parties, especially the Hindu right wing, according to their agendas. In 1986, the opposition hijacked the protests against the Muslim Women's Bill to attack the minority community. In 1987, a section of the opposition, in a perverse appropriation of the arguments for women's agency, argued for women's right to "voluntarily" commit Sati. These phenomena were

precursors of a bigger agitation that would lead to widespread communal riots in different parts of the country.

The formulation of women as the guardians of the virtue of a community was at the centre of much of the narrative used to other the Muslim community – the allusions to a golden past – without any consideration of historical evidence or chronology – where Hindu women had elevated status, framing the contemporary discrimination against women as necessary restrictions for their protection put in place after the invasion by Muslims, and the legend of soaring Muslim fertility rates that would soon lead to the Hindu population being overcome in numbers, were all constructed on the turf of the politics of gender. The women ascetics who emerged as the voice of the Ramjanmabhoomi agitation urged Hindu men to fight for the protection of the honour of their women. The Hindu right, with its flexibility to accommodate certain notions of modernity like the women's education and employment, managed to woo into its folds multitudes of middle class women. For them this space – provided within the Hindu right wing sphere with its explicit commitment to maintaining the sanctity of the family – was easier to access without antagonising their families than those

provided by the mainstream women's movement. The frameworks of these organisations, however, remained deeply patriarchal and firmly rooted in the belief that the family had absolute ownership over women's time, labour and bodies.

Women in the Box

When, post further and deeper economic reform and liberalisation in the early 1990s, transnational satellite television entered the Indian market, there was hope that this would lead to more varied and sensitive programming on national television. But the market proved to be a censor of equal, if not greater, calibre. The satellite channels like Star TV and Zee TV catered specifically to the urban middle class, which was the target audience for the corporations that bought advertisement slots. The indigenous programmes offered by these channels was sweepingly homogenous in representing the Hindi speaking urban middle class, not allowing even the token representation that state sponsored television reserved for regional and class diversity.

The economic reforms of 1991 had led to a massive boom in service sector employment, many young women from middle class

backgrounds started living away from home, which introduced them to new freedoms and anxieties. *Tara*, a popular serial telecast on Zee TV between 1993 and 1997, portrayed single working women living together, leading complicated lives and making complicated choices. Another, slightly older contemporary of Tara, Doordarshan's *Idhar Udhar*, approached the depiction of single working women living together from a comic angle. There were also shows portraying the complexities of marriage, like Saans and Kora Kagaz. But the serials were soon homogenized further, and started portraying some version of the "new Indian woman" who is modern and educated, might be employed, but also unfailingly puts family first – and shoulders the triple burden of work, household duties and engagement with the community with an unfaltering smile.

By the late 90's, adding to the capitalist censoring of content, were increasingly frequent episodes of moral policing that tried to control the depiction of women on screen on charges of obscenity, or of offending religious sentiments. While Deepa Mehta's *Fire* faced violent protests for its on-screen depiction of lesbianism, the same director was prevented from shooting *Water* in India since it depicted the poor condition of Hindu widows. This, the protestors

argued, was irrelevant, since it was a thing of the past, and would only offend Hindu sentiments.

Good News, Bad News

The coverage of news, which was expected to improve with the withdrawal of explicit state control, maintained a similar urban bias. As Uma Chakravarty notes in an EPW article, the coverage of the Kargil war, which struck at the close of the decade, was characterised by aggressive nationalism, and obscured all critiques of war as a tool of conflict resolution. The chat shows and debates aired on these channels also had an exclusively urban and middle-class focus. By the 90's, the model of advertisements had changed – ads now interrupted narratives and news bulletins. In a tone strangely prescient of the present times, when social media is constantly bombarding us with a melange of news and advertisements, Chakravarty observes:

> *The only time the other India (that outside the urban, middle class consumers) comes into focus is in the news during election time or in the form of disaster stories – natural havoc, or class, caste and ethnic violence. But*

before anything sinks in this reality too is immediately overlaid by the glossy urban India via the mandatory commercial breaks which must go on regardless of the tragedies that the news might fleetingly bring to the viewers consciousness; 'commerce is clearly above tragedy' and the ads impose their own reality as the camera cuts from the particularities of a tragic event to the universality of consumption desires. What does this do to our sense of comprehension? Does the other India register even when the camera does focus on it when every two and a half minutes our senses are invaded by the ubiquitous lure of goods?

The culmination of this increasing urban, middle class focus in national discourse was a modification of the very parameters of development. Globalisation came to be viewed as an indicator, rather than a tool, of national development. As Prabha Krishnan and Anita Dighe observed, "educated articulate persons view their own and the country's progress and development in terms of the goods and services available to the elite." This desensitization of the politically powerful middle class to the existence of other realities aside from

their own, meant that the evils of globalization remained largely excluded from public discourse and hence unmitigated. These evils were particularly prominent for vulnerable women – as corporations turned to them for cheap, flexible employment, as they were left behind with domestic and often breadwinning responsibilities in rural areas when the men migrated to cities, and as they were tasked to bear the emotional burden and to provide a sense of familiarity as their families adjusted to unfamiliar surroundings. The networks of women's centres and the strength of the women's movement suffered as they were ignored or vilified in public discourse.

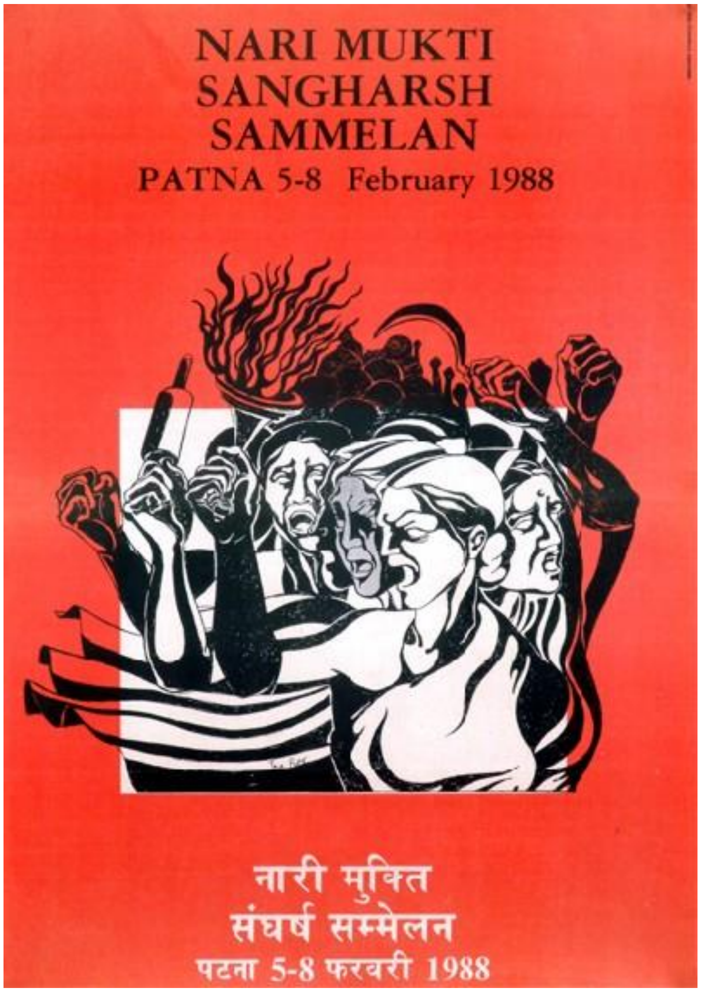

Despite the many tensions between the urban and the mass-movement oriented feminists, the Sammelan showed that the Indian women's movement does still have a common feminist perspective.

Gender In-difference

In an essay titled, "Communalising Gender/ Engendering Identity," Ratna

Kapoor and Brenda Cossman identify three approaches to the question of gender difference. According to the first, women are perceived to be fundamentally different from, more specifically weaker than, men, and hence need to be protected with special provisions. The second approach sees men and women as equal in the eyes of the law, and hence any legislative provision that treats men and women differently is seen as unacceptable. This is consistent with the formal notion of equality. According to the third approach, women are considered to be a historically disadvantaged group, and some “positive discrimination” is deemed necessary to prevent the perpetuation of underlying inequalities – an approach consistent with the notion of substantive equality.

The patriarchal discourse, which perpetuates gender roles, represents the first, protectionist approach. The proponents of this approach often dismiss the concept of sameness as a “Western concept of equality” inconsistent with Indian traditions. Despite the dominance of the protectionist view, the sameness view had started making some inroads in the 90’s, particularly in context of the liberalisation during this period. Both approaches, however, fail to grasp the disparate effect that gender neutral legislation often has

on men and women, and the necessity of legal support for women to overcome centuries of subordination and to participate in social and political processes in equal capacity. Currently women represent a meagre 13% of Indian Parliamentarians. The participation of women in the decision-making bodies of the major political parties is also dismal. While reservation of one third seats at the Panchayat level was introduced in 1993 and has increased the participation of women in local government, a similar provision for parliamentary elections has been pending for twenty odd years.

The formal notion of equality has since then established firm roots in the psyche of Indians. The anxiety of not conforming to this notion sometimes leads women to disavow feminism altogether, and to overcompensate for any special provisions that they might receive as women. This year, during the celebration of women’s day in the Rajya Sabha, a woman MP from the ruling party suggested that Men’s Day should also be celebrated, while during the same session, the male chairman cut off another woman MP from the opposition as she spoke about the increase in violence against women, insisting she speak about “positive” matters on the celebratory occasion. Several women MPs urged the house to focus

on the women's reservation bill, but whether this will be acted upon is yet to be seen.

Three Dots

In recent times, with the focus on intersectional feminism on the international front, many Indian feminists have turned their gaze inwards. However, this is mostly achieved through the application of frameworks developed elsewhere to Indian contexts and the awkward modification of trending hashtags. Because of the ubiquity of the populist narratives of history that focus on personalities rather than the evolution of ideas, young feminists are deprived of the rich treasure trove of the experience of their forerunners. A dive into the history of the women's movement in India can lead to the discovery of valuable insights that would help us build an inclusive movement crucial for the reinvigoration of the struggle for social justice – especially important as unprecedented, horrifying disasters continue to affect women disproportionately.

****

দেবেশ রায়ের উপন্যাস ও বাংলা সাহিত্যের বিষয় আঙ্গিকের অন্য বয়ান: (১৯৯১- ২০০০)

জবা বৈরাগী

প্রচ্ছদঃ সুমন মুখার্জী

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের প্রচলিত গতির বাঁকবদল দেবেশ রায়ের হাতে। তাঁর উপন্যাস রচনার কৃৎকৌশল অন্য আঙ্গিক এবং ভিন্ন বয়ান তৈরি করেছে। তিনি বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে বসে লিখছেন সত্তরের দশক ,আশির দশক ,নব্বই দশকের সমাজবাস্তবতা নিয়ে। বাংলা উপন্যাসের ঋতুবদল হচ্ছে তার হাত ধরে। নতুনের ডাক যখন আসে তা দশক শতকের বাধা মানে না। বাংলা কাব্য কবিতার ক্ষেত্রে যেটা ঘটে গেছে , উপন্যাসের ক্ষেত্রে তা হয়নি সোয়াশো বছরেও। তাঁর সমসাময়িক ঔপন্যাসিকদের থেকে তাঁকে স্বতন্ত্রভাবে চেনা যায় রচনা শৈলীর পার্থক্যে, বিষয় নির্বাচনের পৃথকতায়।

আমরা লক্ষ্য করি কিভাবে তিনি প্রচলিত উপন্যাসের ধারা থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছেন , উপন্যাসের সার্বিক কাঠামো নিয়ে – অর্থাৎ আমাদের এতদিনের যে উপন্যাস পাঠের অভিজ্ঞতা তাতে আমরা দেখেছি যে বইয়ের পাতা যত উল্টেছে, কাহিনী তত খুলতে থাকে, ঔপন্যাসিক চরিত্রগুলোর জীবনের একটা নির্দিষ্ট সময়কে নির্বাচন করেন ও তার আবর্তন -বিবর্তন দেখান। তার একটা সুখকর বা দুখকর পরিণতি দেখান। দেবেশ রায় এই পথের পথিক নন। তাঁর উপন্যাস পড়তে গেলে দেখা যাবে ঔপন্যাসিক প্রায় গোটা উপন্যাসটিকে ন্যারেট করতে করতে হঠাৎ কাহিনীর গভীরে ঢুকছেন, সেখানে একটা চলমানতা রেখে আবার ফিরে আসছেন উপরিভাগে। একটা কাহিনী জন্ম দিচ্ছে আরো অনেক কাহিনীর। তিনি মূলত কথা বলছেন বর্ণনার মাধ্যমে, এবং সেটা গল্প বলার ভঙ্গিতে নয়, বর্ণনার মধ্য দিয়েই। লেখক নিজেই যেন সর্বজ্ঞ কথকের ভূমিকা পালন করছেন এবং উপন্যাসের চরিত্র হয়ে উঠছেন।

তাঁর পরিচ্ছেদ নির্মাণের ক্ষেত্রে বঙ্কিমী সাদৃশ্য লক্ষণীয়। বঙ্কিমের মতই তিনি প্রতিটি পরিচ্ছেদের আলাদা নামকরণ করেছেন, কিন্তু পাঠকের সাথে সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে বঙ্কিমকেও অতিক্রম করে গেছেন। তার কারণ, বঙ্কিম চরিত্রের কথা বলার মধ্যে সামান্য একটু সংযোগ স্থাপন করেন, কিন্তু দেবেশ রায় সম্পূর্ণ একটি আলাদা পরিচ্ছেদ নির্মাণ করেন এবং তার নামকরণ করেন এরকম – 'পাঠকের কাছে নিবেদন 'বা 'লেখকের স্বীকারোক্তি' । এ তো বাংলা উপন্যাসে একেবারে নতুন আর ব্যতিক্রম ।

তাঁর উপন্যাসের দৃশ্য বর্ণনা ভীষণ নিখুঁত এবং নিপুণ। যেন ক্যামেরাকে ক্লোজ আপে রেখে একটা একটা করে জিনিস দেখানো। এর মধ্যে দিয়ে যে জিনিসটা বলতে চাইছি সেটা হলো – এই সমস্ত প্রক্রিয়ার মধ্যে সময়টা যাচ্ছে বেশি, কারণ তাঁর উপন্যাসের চরিত্র তো আর নিজের স্বাভাবিক গতিতে বেড়ে উঠছে না , চরিত্রগুলি পুরোটাই লেখকের বর্ণনা দ্বারা গড়ে উঠছে, ফলে যে কোনো ঘটনাই অতিরিক্ত বিস্তৃত হচ্ছে । কোথাও এক লাইনের বক্তব্যকে আলাদা আলাদা ভাবে বর্ণনাবহুল বাক্যে প্রেজেন্ট করছেন । Same structure – এর এতোবার প্রয়োগ এবং এতো কনফিডেনসের সাথে এর আগে দেখা যায় নি। বাক্য নির্মাণের এই কৌশলগুলো দেখে মনে হয় পাঠকের মতিভ্রম করার একটা সচেতন প্রচেষ্টা রয়েছে। এই প্রয়োগকৌশলের ফলে পাঠকের অধৈর্য বুড়িয়ে উঠতে চেষ্টা করে। তবে সবকিছুর মধ্যে একটা পাগলাটে নতুনত্ব আছে। বাক্যের গড়নের মধ্যে রয়েছে একটা আশ্চর্য বলিষ্ঠতা। একটা বাক্যে অনেক সময় দু তিনটি ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হচ্ছে এবং ক্রিয়াপদগুলি পরপর ব্যবহৃত হচ্ছে আর তাতে করে লেখায় আসছে একটা গতিময়তা। আবার অনেকক্ষেত্রে মনে হতে পারে বর্ণনাকর্তা গোটা

ঘটনা থেকে এত শক পেয়েছেন যে, হয়তো বারবার এক কথা বলার মধ্য দিয়ে চরিত্রের বিকৃতির প্রকাশ ঘটাচ্ছেন।

উপন্যাস পাঠ করে পাঠকের মনে হয়না যে উপন্যাস শেষ হয়ে গেলো। একটা গতিময়তা থাকবে, কাজ করবে ইতিহাসের চলন। মনে হবে উপন্যাসে বর্ণিত কাহিনী আগেই ঘটে গেছে। তিনি নতুন কোনো গল্প শোনাচ্ছেন না বরং সেই ঘটে যাওয়া কাহিনী বর্ণনার মধ্যে দিয়ে নির্মাণ করছেন গবেষণার সন্দর্ভ। প্রশ্ন করছেন রাষ্ট্র – প্রগতি – ইতিহাসকে। যুক্তির উপর যুক্তি সাজিয়ে উত্তর নির্মাণ করছেন, আর প্রশ্ন রেখে যাচ্ছেন উত্তরপ্রজন্মের কাছে।

তাঁর কালচেতনায় ইতিহাস-বর্তমান-ভবিষ্যৎ মিশে যাচ্ছে গতিশীলতার মধ্য দিয়ে । দেবেশ রায় ইতিহাসের তন্নিষ্ঠ পাঠক, তাই তাঁর লেখনী অন্যতর এক বোধ সংক্রামিত করে পাঠকের মধ্যে ; পাঠ্যবইয়ের ইতিহাসের সরলরৈখিক প্রগতিকে তিনি অস্বীকার করেন। তাই তো কি এক অনিবার্য তাড়নায় বিংশ শতকের শেষ দশকে লেখা এক উপন্যাসে তিনি ফিরে যান সত্তর দশকের সেই আগুনঝরা দিনগুলিতে। বিশ্বনাথ চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে উঠে আসে একটা গোষ্ঠীর রাজনৈতিক ইতিহাস। সেই রাজনৈতিক ইতিহাস আজ স্মৃতি কিন্তু বিদ্রোহের আঘাত এখনো শেষ হয়নি। যে ইতিহাস বারবার ফিরে আসে প্রতিরোধের স্পর্ধা হয়ে। রাষ্ট্রের নির্মমতার ইতিহাস যেমন সত্যি, মানুষের প্রতিরোধের ইতিহাসও তো চিরকালীন। যে ইতিহাসের নাগরিক মুক্তকণ্ঠে বলে ওঠে – ‘ এই সংবিধান মানি না , এই রাষ্ট্র মানি না ‘। রাষ্ট্র মরিয়া হয়ে উঠলে শুরু হয় সাংবিধানিক নিগ্রহ। সেই নিগ্রহের সময়ের বৃত্ত শুরু হয় নকশাল আন্দোলনে এবং সম্পূর্ণ হয় শিল্পায়নকে কেন্দ্র করে

মফস্বলের মানুষের এক অনিবার্য প্রতিরোধের কাহিনীতে (পাড়ারিয়া ধর্ষণকান্ড আর পুনাসি বাঁধ নির্মাণ) দুটো ঘটনার মধ্যে সাযুজ্য রক্ষিত হয়েছে সংবিধানের ছিদ্রপথে। গণতন্ত্রের পুলিশ সংবিধানকে লোপাট করে দেওয়ার অধিকার অর্জন করেছে। রাষ্ট্রযন্ত্রর যে ভয়াল রূপচ্ছবি ফুটে উঠেছে এই আখ্যানে , আজকে দাঁড়িয়ে তার প্রাসঙ্গিকতা নতুন করে বলে দিতে হয়না।

তিনি উপন্যাসে সময়ের দুটি মুখশ্রী নির্মাণ করেছেন। একটা শিল্পায়নকে কেন্দ্র করে নদীমাতৃক অরণ্যসংকুল জীবনযাত্রা বদলের আত্মসংকট , তার সাথে শিল্পায়নের নিগ্রহ- প্রান্তশায়ী জনজাতির গণঅভিমুখের অবয়ব বদল আর তার বিপরীতে নগরকেন্দ্রিক জীবনযাত্রা। ‘ইতিহাসের লোকজন’ উপন্যাসের প্রধান দুটি চরিত্র – অধ্যাপক সৌরাংশু ও তার গবেষকছাত্রী শমিতা তাদের গবেষণার মধ্য দিয়ে শহরের কলোনি বা বস্তিবাসীদের জীবনযাত্রার সংকট উন্মোচন করেছেন। সোভিয়েত উত্তরকালে সারা পৃথিবীব্যাপী সমাজতন্ত্রের পতনে মার্ক্সবাদী অর্থনীতিবিদ সৌরাংশু আজ অবলম্বনহীন। ‘..শ্লেষে, আত্মপীড়নে অধীত বিদ্যাকে উল্টেপাল্টে, নিজের জ্ঞানতত্ত্বকে ঠাট্টাবিদ্রূপে টুকরো-টুকরো করে, নিজের আস্তিক্যকে পরিহাসে-পরিহাসে বিপর্যস্ত করে’ সৌরাংশু নিজেই নিজের সাথে সংলাপ চালান। আর শমিতার গবেষণার ফাইল দেখতে দেখতে সৌরাংশু উপলব্ধি করেন—‘...তাঁর, তাঁদের সমস্ত মার্ক্সবাদচর্চা ভারতীয় ধনতন্ত্রের সংকটকালীন আত্মসমালোচনা। ভারতীয় ধনতন্ত্রও ধনতন্ত্রই। ভারতীয় বলে সে কিছু আধ্যাত্মিক নয়, সে উৎপাদনকে কিছু কম বিমূর্ত করে তোলে না , সে কিছু কম তৎপর নয়। বরং যেনো প্রাক্তন উপনিবেশের ধনতন্ত্র বলে সে কিছু অতিরিক্ত লাম্পট্যের সুযোগ পেয়েছে। আর সেই লাম্পট্য সত্ত্বেও ধনতন্ত্রের নিয়মেই ভারতীয় ধনতন্ত্র সমস্ত

কিছুকে গ্রাস করে নিতে পেরেছে। মার্ক্সবাদকেও।’ শমিতার গবেষণার বিষয় সেই কাজের মেয়েটিকে কেন্দ্র করে তারা তর্ক চালান – “..

‘...কিন্তু আপনি যে রকম বলছিলেন মেয়েটি ইকোনমিক ম্যানের ধারণাটাই প্রত্যাখ্যান করছে, তাও হয়তো নয়।’

‘নয়ই ত। এই কথাটাই তো আমরা ভুলে থাকি। ধনতন্ত্রের অপ্রতিহত যাত্রা সত্ত্বেও লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি মানুষের মধ্যে প্রাকধনতন্ত্রের সব বন্ধন, মনের বা কাজের, ঘুচে যায়নি, যাবে না। হয়ত এটা কলোনিবিস্তারের পর্বের পক্ষে সম্ভবও ছিলনা । .....মুশকিলটা কি জানো শমিতা? পুঁজি জমালেই ত আর ধনতন্ত্র হয়না, পুঁজি না জমালেও সমাজতন্ত্র হয় না। আমাদের দেশে গত চল্লিশ বছরে জনসংখ্যার মাত্র তিরিশ শতাংশকে ধনতন্ত্রের কব্জায় আনা গেছে । বাকি সত্তর শতাংশ, এখন ধরতে পারো সত্তর কোটি মানুষ ই, এই সবকিছুর আওতার বাইরে। কিন্তু মজাটা হচ্ছে ভারতবর্ষের জনসংখ্যার এই তিরিশ শতাংশই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বা সোভিয়েত ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যার প্রায় সমান। আর তাতেই তো তোমার ধনতন্ত্র যে ধনতন্ত্রই তা স্বীকৃত হয়ে যায়। এ সবই ত আসে ঐ একটা চিন্তা থেকে – মানুষের ইতিহাসে ধনতন্ত্র একটা অনন্ত শক্তি। এই ধারণা থেকেই তৈরি হয়েছে – টেকনোলজির আর আর্থিক উন্নয়নের ধারণা। অথচ মার্ক্স তাঁর ক্রিটিকে ইতিহাসে ধনতন্ত্রের স্থায়িত্বের ধারণাটাকেই সবচেয়ে বেশি আক্রমণ করলেন। ‘ ...”

পাঠক হিসেবে আমরা বুঝে উঠতে শুরু করি যে আস্তিক্য আর জ্ঞানতত্ত্ব সৌরাংশুর ব্যক্তিত্বের ওতপ্রোত উপাদান সেই বিশ্বাসে তিনি স্থিত থাকতে পারছেন

না। কারণ ধনতন্ত্র নিজেকে সঙ্কটমুক্ত করতে সক্ষম এই সত্যের পাশাপাশি তাঁকে এ কথাও মেনে নিতে হচ্ছে -‘সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাই সমাজতন্ত্রের সবচেয়ে বড় শত্রু।’ সমগ্র উপন্যাস জুড়ে এই টানাপোড়েন চলতে থাকে ; লেখক প্রশ্ন তোলেন – ‘সৌরাংশু তাঁর আস্তিক্য আর জ্ঞানতত্ত্বের বিপরীতের সঙ্গে নিজের সারাটা যাপিত জীবনকে মেলাবেন কী করে? ‘মনে হয় এ যেন লেখকেরও আত্মজিজ্ঞাসা।

‘তিস্তাপুরাণ’ উপন্যাসের বুনন বাংলাসাহিত্যে এক মৌলিক ব্যতিক্রম। এই উপন্যাস প্রচলিত উপন্যাসের গড়নশৈলী ভেঙে নির্মাণ করে টুকরো টুকরো অধ্যায় । কি নাম দেব একে? – পরিচ্ছেদ নাকি অধ্যায়! উপন্যাসের সূচনা হয় ‘বুড়িমা’ নামক পরিচ্ছদের মাধ্যমে। আশ্চর্য এই যে এই অংশে বুড়িমার চরিত্র বর্ণনা অনধিক দুই লাইন – বাকিটা লেখক নির্মাণ করেন প্রকৃতি দিয়ে এবং বুড়িমাকে বর্তমান থেকে ইতিহাসে নিয়ে যান। ঘটনাক্রম এগোয় আর বুড়িমা সাধারণ মানবী থেকে অলৌকিক হয়ে ওঠেন । বুড়িমা আদিম জনজাতির প্রণেতা । প্রকৃতির সাথে সেইসব মানুষের মিথোজীবিতা সুপ্রাচীন – যেন এরা প্রকৃতিমানুষ। যেখানে পুরাণকন্যা, পুরাণপুরুষের মতো মিথের নবজন্মের আশা বেড়ে ওঠে।

তাঁর উপন্যাস আসলে অরণ্যসংকুল বা নদীতটবর্তী জীবনযাপন বদলের পথ। আধুনিক প্রযুক্তি গিলে নিচ্ছে সেই আদিম সভ্যতাকে। মানবজাতির এক দীর্ঘ পরিবর্তনের ইতিহাসকে ধরছে ‘তিস্তাপুরাণ’। তিস্তার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে ভূমিজ অধিবাসীদের যে যৌথযাপন, তাতে কোথাও ব্যক্তিমালিকানার স্থান ছিলনা। কিন্তু সেই অঞ্চলে ঝান্ডা বসিয়ে জমি জরিপ হলো, কালো রাস্তা , স্কুল, চাষবাসের উন্নত যন্ত্রপাতি আর তিস্তার বুক চিরে লোহার ব্রীজ – সব মিলিয়ে প্রযুক্তি মুছে দিলো

আদিমতার গন্ধ , যৌথযাপনের ইতিহাস, শুধু আদিম সত্তার সেই আকুতিটুকু স্মৃতি হয়ে রয়ে গেল যা হয়তো পরবর্তী প্রজন্মের কাছে রূপকথা হয়ে ধরা দেবে – হয়তো আধুনিকতার আলোকপ্রাপ্তি তাকে মিথে পরিণত করবে। ইতিহাস বড় নির্মম। এই ঘটনাগুলি থেকে বোঝা যায় ভারতবর্ষ যে খন্ড খন্ড হয়ে শিল্পায়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে – দেবেশ রায় তাঁর লেখায় সেই নির্মমতার ইঙ্গিত রেখে যাচ্ছেন।

তাঁর ৯০’ র দশকের উপন্যাসগুলিতে তথাকথিত নায়ক নির্মাণ নেই বললেই চলে, আর যেটুকু নায়ক নির্মাণের প্রসঙ্গ এসেছে তার একটা আলাদা ভাষ্য রয়েছে । ‘সময় -অসময়ের বৃত্তান্ত’ উপন্যাসে কেলু চরিত্রটি বাস্তবতারহিত হয়ে প্রায় নায়ক হয়ে উঠছিল। বাকি আখ্যানগুলির সাথে তার সংযোগস্থাপন প্রায় অলৌকিক। কেলু উদাসীন, আধপাগলা এক চরিত্র – সে গণস্মৃতির আধার। তাকে নিয়েই লেখক রচনা করলেন প্রায় তিনখানা আখ্যান। ধর্ষণের ঘটনার পরে কেলুর নিজেকে আবিষ্কারের যাত্রা শুরু। কুশলী দক্ষতায় লেখক আঁকছেন- কেলুর মধ্যে গড়ে উঠছে শহুরে জীবনবোধ , খিদের বোধ। তার বাঁচার তীব্র আশা থেকে মৃত্যু পরিকল্পনা , সন্ন্যাসীর শিষ্য হওয়া – এই অংশে তার চেতনার বহিঃপ্রকাশ একরকম । এরপর শুরু হয় কেলুর জীবনে নতুন অধ্যায়। কেলু সভ্য নাগরিক হয়ে ওঠার চেষ্টা করে। এই প্রথম কেলু সভ্য সমাজের খিদের সংযত রূপটা খানিক বুঝতে পারছে , তার নিজের চোখ দিয়েই কেলু কলকাতাকে আবিষ্কার করছে। লেখক যেন অঙ্ক কষে কেলুর জন্ম , মৃত্যু এবং যাপনের নিয়ন্ত্রণকর্তা হয়ে উঠছেন। পাঠকের সামনেই চরিত্রের জন্ম – মৃত্যু এবং বাঁচবার সীমারেখা নিয়ন্ত্রণ আর পাঠকের সাথে যৌক্তিক ভাবে আলোচনা করেই চরিত্রের পরিণতির সিদ্ধান্ত –

যেন এটা উপন্যাস নয় , লেখক আর পাঠকের মধ্যে ঘটে চলা নিরন্তর মিথস্ক্রিয়া। এখানেই দেবেশ রায় অনন্যপূর্ব ; দেবেশ রায় দেবেশ রায় ই।

তাঁর উত্তরবঙ্গকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলিতে আঞ্চলিক ভাষা বিশেষত রাজবংশী উপভাষার প্রভাব লক্ষণীয়। যেসব জনজাতির মুখে তিনি এই ভাষা বসিয়েছেন তাদের কাছে জীবনসংগ্রামের চেহারাটাই অন্যরকম। ‘ইতিহাসের লোকজন’ উপন্যাসের ঠিকের কাজ করা অশিক্ষিত মহিলাটি এটা পর্যন্ত জানে না সে কোথায় বাস করে, কোন ভূখন্ড থেকে উৎখাত হয়ে সে আজ কলকাতার উদ্বাস্তু! সে শুধু জানে তার কাজের রেট। কলকাতাই তার বিলেত, প্যান্ট-শার্ট পরা কলকাতার বাবুরা তার বিলেতের বাবু। সে জানেনা তার নিজের বয়স, তার বিয়ে, এমনকি তার সন্তানদের বয়স! হয়তো জানতে চায়নি, জোর করে ভুলে গেছে তার অপ্রয়োজনীয় অতীতকে। প্রত্যাখান করেছে স্মৃতিকে, ইতিহাসকে। নামগোত্রহীন এই মহিলা আর ‘তিস্তাপুরাণে’র পুরাণকন্যা, পুরাণপুরুষেরা ভানুমতীর মতই জানেনা ভারতবর্ষ কোনদিকে! জন্মান্তর পেরিয়ে কেলুর মত প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে হাঁটতে হাঁটতে এরা হঠাৎই আবিষ্কার করে প্রগতিশীল ভারতরাষ্ট্রে তাদের ঠাঁই নেই। তারা সর্বহারা নয় – সর্বস্বহারা।

দেবেশ রায়ের উপন্যাসের স্বতন্ত্রতা তার আঙ্গিকের অভিনবত্ব আর আখ্যান জুড়ে ঘটে চলা নির্মাণ – বিনির্মাণ। চরিত্রসৃষ্টির ক্ষেত্রে লেখক নির্মাণ থেকে বিনির্মাণ আবার বিনির্মাণ থেকে নির্মাণের পথে যাত্রা করেছেন। নির্মাণ বিনির্মাণের মধ্যে যে গতিময়তার প্রবাহ তাকেই তিনি ধরেছেন, ছেড়েছেন আবার নিজের খেয়ালে ভেঙেছেন। এই দুইয়ের মধ্যবর্তীকালীন সময়ের অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়েছেন চরিত্রগুলিকে। তাই তিনি শুধুমাত্র একজন ঔপন্যাসিক নন – তিনি

একজন তত্ত্বনির্মাতা। তাঁর সারাজীবনের সন্ধান ছিল এক ভারতীয় আখ্যানরীতির , যে আখ্যানের শিকড় পৌঁছে যাবে আমাদের ভারতীয় চৈতন্যের গহনে । তাঁর নিজের ভাষাতেই -" ...সারা পৃথিবীর মধ্যে আমাদের এই বাংলার উপর দিয়েই বয়ে যায় রহস্যময় এক সামুদ্রিক বাতাস তার নাম মৌসুমী বায়ু । অথচ আমাদের উপন্যাসে সে-বিবরণ লেখা হল না – কোন খাত দিয়ে কী বাতাসে আমাদের গাছপালা দোলে। আর,এই নদী, এই বৃষ্টি, এই বাতাস, এই পাহাড়, এই সমতল আর এই সমুদ্রকে অন্বিত করে যে-মানুষ সে তার নিজের বাঁচার কাহিনী নিয়ে আমাদের উপন্যাসে এল না। আমরা উপন্যাসে কাহিনী খুঁজেছিলাম, কাহিনীর সেই মায়ামৃগ আত্মপরিচয় থেকে আমাদের আরো দূরে দূরে সরিয়ে এনেছে। বাংলার গল্প- উপন্যাসের আধুনিকতা তাই এখনো তাত্ত্বিক তর্কের বিষয়। শ্বাসেপ্রশ্বাসে , ঘামে রক্তে , প্রতিমুহূর্তের স্বকীয় বাঁচার কঠিন আনন্দে স্পন্দ্যমান সেই আধুনিক মানুষ আমাদের উপন্যাসে তার মহিমময় বাঁচা নিয়ে এসে দাঁড়ায় নি যে তার দিকে তাকানো মাত্র সব তত্ত্ব অবান্তর হয়ে যাবে ।" (১৯৮৮, 'উপন্যাস নিয়ে')

এভাবেই দেবেশ রায় এক আশ্চর্য মানবিক আলো জাগিয়ে রাখেন শেষাবধি। তাঁর তত্ত্বনির্মাণ বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে এক অন্য আধুনিকতার ঐতিহ্যের পত্তন ঘটায়। আর তাই বিশ শতকের শেষ দশকের রচনায় ঔপন্যাসিক দেবেশ রায় হয়ে ওঠেন বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের আঙ্গিকের নতুন মডেল।

****

90'S Food: The Birth Of A Culture

Debolina Ray

Illustration: Suman Mukherjee

One of my earliest memories of exploring food goes back to when I was barely 10 years old, and my mother would take me along on her shopping escapades in New Market after school. Footpaths bustling with stalls and vendors, hawkers at their creative bests, shouting for our attention, fellow shoppers brushing past us with the brisk purpose afforded only to a seasoned shopper, and of course, the questionable aroma of food frying somewhere on the street mixed with general sweat and humidity – and amidst all of it, my mother striding on deliberately with one hand tightly clasping mine. After shopping to the point of exhaustion, buying everything from table cover to cutlery, bone china cups to fancy nightdresses – there was, inevitably, a food stop. Well not just one. We had a well-tested routine. Start with jhal muri and dahi vada, then go into Monginis for some patties, shammi kebab and to stand in the AC for a bit. Then some more street shopping, hard bargains and bunch of plastic bags, after which we would head to Aminia for our Biryani stop, and sometimes even teatime snacks at Nahoums. This routine never wavered – no matter how full we were, how tired we felt, or how long the waiting queue stretched because food, has always been essential to a shopping spree.

Needless to say, I was a 90's kid through and through and growing up in India in the 90's was an exciting affair. 'Cable TV' was just beginning to come to households, bringing with it primetime telecasts of The Bold and The Beautiful and Baywatch. Kids were grooving to the latest pop music videos by the likes of Britney Spears, Backstreet Boys, and Boyzone. There was a whole new lifestyle seen in these soaps and videos, right from outfits and trends to food and traveling. It was also a time when India had a huge influx of foreign brands, at least in the metro cities like Delhi, Mumbai, and Calcutta. What did all these changes mean for the Indian cities? Suddenly there was a lot to catch up to with the western world in a very short time – and eventually, over the coming decade, this culture shock would change the very lifestyle of the Indian urban crowd.

Before the 90's, eating out meant an expensive affair and was usually reserved for a grand occasion. There were clear categories of restaurants – Indian, Chinese and Continental. The outing was made into an elaborate event – putting on one's Sunday finest, indulging in a taxi so you're not disheveled by the time you arrive at the restaurant, booking a table and combing through the menu – trying

to decide between the safe favorites or exploring something new. Stand-alone restaurants weren’t many, and usually dining with children usually meant going to a place that did not serve alcohol, which led to the options being quite limited. In our family, these “special” fine-dining events happened usually if I won prizes in school or on birthdays – in a nuclear family, there weren’t that many reasons to celebrate in style. But the go-to stops were always our favorite places in the city – Waldorf for Chinese or Mocambo for Continental. We always knew what to order, and it was comforting to soak in these classic places that had been around for years.

Then the 90’s arrived. The New Economic Policy (NEP) in 1991 opened up the Indian Economy to foreign investments, better technology and tougher competition, almost surely plunging India into a globalization arena. The Indian market began to change – and with it, the demands of the Indian middle class. More and more international brands proliferated the market. At the same time – with the newly opened economy facilitating a lot of new airline routes at budget prices – there was an increase in international as well as interstate travel. So, the 90’s middle class had money to spend, and an unprecedented exposure to cultural experiences

outside of their local comfort zone. One of the most interesting effects of this could be perceived in India's food culture – international food brands with partnerships in India had money to invest, and the restaurant business went on to become one of the highest employing sectors in the country, hiring chefs, service and cleaning staff, ushers and more. There were also well-travelled folks coming back to their homes, having experienced a taste of international food, and willing to explore different cuisines.

The 90's also saw the first television cookery shows in India. Cookery shows at that time were not just about recipes and dishes, but a platform for people to learn about international cuisines, exotic dishes, and innovative ingredients. Some of the shows even dabbled in virtual tourism along with the food and culture. One of the first shows of this kind was Sanjeev Kapoor's Khana Khazana, which ran for a whopping 17 years on Zee TV. Then there were Tarla Dalal, Aditya Bal, Ritu Dalmia, Kunal Kapoor and many more celebrity chefs that hosted a slew of successful TV shows, with regular spin-offs that ran in regional channels as well. This led to dishes being experimented on, at home, and food cultures becoming slowly more diverse. Exotic pastas were now being made in an

Indian household, with an indigenous twist – and of course, the kids benefitted the most as the primary tasters and critics!

The palate of a country, however, is never merely defined by what gets served in the restaurants, or at home – but also by what sells on the streets.

When our grandparents and parents tell us they hardly ate junk food growing up, it's probably true – There wasn't much in the name of processed food back in the day. Now that's not saying *pakoras* and *jalebis* were healthy, but at least the ingredients and sourcing made them better suited for our systems. We were never really a nation and culture of grab and go when it came to food. Eating, even in the busiest of times, and with limited income, was traditionally an elaborate and multi course affair. By the time the 90's came around though, junk food was already a firm fixture in the Indian food scene. But it was heavily local, and mainly street side – with chaats, rolls, vada pavs, dosas, pani puris, ice pops and candies, bakery food like filo pastry with fillings called patties or puffs depending on what part of India you were in. In contrast – I remember when the first Domino's Pizza outlet opened near my place – the thin paper menus, the aromas of dough in the oven

wafting through the open kitchens and filling up the place, the hot card-board boxes piled up and taken out by the uniformed delivery folks with an unfamiliar sense of urgency. Ordering and getting food delivered quickly so we could be on our way, was a curious and fascinating novelty. And slowly, it came to be that we started saving more of our pocket money for these luxuries than spending on knick knacks and street side indulgences like *phuchka* and *choor moor*, though it was hard bargain indeed.

Snacking is inherent to our country’s food culture, and you could see that reflected in the way our festivals, shopping grounds, exhibitions and even roadside *melas* leave a special corner for food. Particularly, I remember the Book Fair – a grand, almost-carnivalesque affair in Bengal – an experience that grew to be as much about food as it was about the rush of new books, elaborate launches, and favourite authors. So, when the new brand of fast foods came as a wave, bringing scale and efficiency to meet the cravings of an entire generation, the changes were here to stay.

The Changing Face of India's Metro Cities and the Origin Story of Bangalore

Radhika Misra, a Marketing Communications Consultant who was finishing college during the 90's, offered us a first-hand account of this many-fold transformation of the Indian palate. Radhika remembers that some of the things we now take for granted growing up, like going out for ice cream – to a parlour, – was a culture that actually came to be in the 90's decade. As a young student in Kolkata and Mumbai, hanging out in restaurants wasn't exactly inexpensive, so for her, it was about priorities and preferences. She recalls that in those days, in Mumbai, there used to be barely any restaurant doing a street food format, (except Kailash Parbat, and that used to be a trip to take to gorge down on some delicious and variety of chaats!) But even before cosmopolitan economies revamped the food scene in the country, Mumbai was set apart by its culinary diversity. For instance, there was the flourishing world of cafes originally opened by Zoroastrian Irani immigrants to India before independence, like Britannia, Café Mondegar, Leopold Café and Bar. A good meal meant Berry Pulao, Mutton Dhansak and Sali Boti, with some traditional Irani chai to

wash it down – classics that have withstood the onslaught of time and western influences. India's sweet tooth however, had a different story to tell. Speaking about her internship with Taj Hotels in Kolkata, Radhika mentioned how desserts during the 90's had already started adapting to western influences, taking the next step from familiar ice creams and cakes to lush, layered desserts and decadent cheesecakes.

But really, it was our conversation about Radhika's next city of work, Bangalore that proved to be a history lesson for me. Bangalore was probably the city that changed the most in 90's. Before this decade, most of us knew Bangalore as the garden city, a retirement haven and a defense base. Growing up, even I would often visit Bangalore in late 90's on vacations as I had family here. During these visits, the now-familiar idea of Bangalore as a "pub city" eventually came to light for me – during stealthy escapades when my cousin would do his due diligence of showing me the city by taking me to every pub possible. Yes, let's just say that checking IDs wasn't much of a thing back then.

Radhika tells us how it all started in the 90's, how this pub city I now call my home, came into existence during the decade with

some popular watering holes. She fondly remembers Black Cadillac, which opened around that time as the place to be. The who’s who of Bangalore would hang out there, and sometimes have chance encounters with rock artists of the era too, visiting the city for concerts! Pub World, Windsor Pub, Pecos – all had distinct clientele, chilled beers, local food and usually good rock music. I remember first seeing ‘Happy Hours’ boards in Bangalore, and for years it remained an essential parameter to pick a place for a party. You see, fancily named cocktails weren’t really a thing back then, probably with the probable exception of Cuba Libre! And why would it - when a pint of beer was about 15 bucks?

Milestones in India’s Food culture

Although the cultural shifts spawned by economic liberalization mostly affected the cities – the 90’s remain a focal point in the evolution of India’s food history – simply because it witnessed so many milestones that have, today, become inextricably associated with our culinary culture.

Specialty Restaurants

The 90's marked the emergence of specialty restaurants – starting with hotels, and eventually stand-alone too – that started catering to the culinary curiosities of the new-Indian middle class. Shyam Rao, Retd. Naval Officer, who was posted in Mumbai, Pune and Vizag during the decade, remembers that there were suddenly options of Indian food beyond Punjabi and Mughlai. Specialty Restaurants started by Anjan Chatterjee opened up their first outlet of Oh! Calcutta in Mumbai, 1994 – bringing Bengali cuisine outside of Bengal for the first time in a fine-dining format. Mahesh Lunch Home had been operational in Mumbai since the late 1970s, serving a simple short menu of Mangalorean food. In the early 90's, however, they started expanding to other coastal dishes -introducing tandoori and coastal food that became a huge success; in fact, their Tawa Fry, Gassi and crab/lobster with butter pepper garlic, put Karnataka cuisine on a national and eventually global platform.

The Cola Wars

Yeh dil maange more!

There was a long list of Indian soft drinks like Citra, Gold Spot, Double Seven that had popped up in the preceding decades and

were thriving, especially since Coca Cola which had made its first entry in India in the 1950s, was ousted after the implementation of the Indian Foreign Exchanges Act in 1977. The 1990s saw a re-entry of the global giant in the Indian market. And thus began the decade long feud between the two biggest cola brands – Pepsi and Coca Cola – taking not-so-subtle digs at each other, launching competitive ad campaigns – a move that captivated the public imagination and boosted sales for both brands. These companies signed some of the biggest movie celebrities for endorsements, with millions of fan following. There were televised and radio ads, hoardings, official sponsorships for Cricket World Cup and print ads to the extent that they became part of grocery lists in households – the drink you always keep handy in your refrigerator. It thus came as no surprise when local cola brands fell casualty to this intensely aggressive marketing and distribution game, eventually being acquired or driven out of the market.

Junk Food Revolution

Another game changer for the food industry were some very prominent brands that entered the Indian “junk-food market” in the 90’s, and managed to completely change the consumption trend for

that generation – changes that have outlived the decade, and brands that have almost become indoctrinated in our fast-food culture.

The Indian Burger

Interestingly, McDonalds and KFC were not the first foreign burger brands in India. Wimpy's from UK had opened up in 1982 in Delhi. There were also various Indian fast food places that had their own form of burgers, and even Bombay's very own Vada Pav had steadily been preparing Indians for the burger revolution. Food historian Pushpesh Pant in an interview with Business Today in 2015 said that the Indian burger palate was already made, and food chains simply had to adapt to that. And adapt they did, opening the world's first McDonald's outlet without beef on the menu, in 1996, New Delhi. For the first time, McDonald's offered vegetarian selections as well – a menu carefully adapted to incorporate the diversities in Indian food preferences. The pricing was also kept competitive ensuring it was affordable for the target population. The real breakthrough gimmick though, was the launch of "Happy Meals" in India (1997), that included a toy and became something of a collectible. The trend caught on rapidly, going on to be adopted by companies ranging from Milo to Lays, and has continued even to this day.

KFC also opened their first outlet in Bangalore in 1995. Interestingly they chose a non-metro city as their launch pad, but Bangalore already had a burgeoning upper middle class population, and already had a trend of families "eating out". This was crucial, because you could open up new dining options, but spending power of the city crowd and their willingness to step out and experiment with food is how these new places would have to survive and thrive. For KFC, however, other challenges proved bigger. In Karnataka, KFC's entry into India was protested vehemently by farmers, pointing out that the growing number of foreign fast-food chains would shift the demand from essential crops to livestock, resulting in sections of society without access to affordable food. KFC eventually surfaced through these protests, and opened up several outlets in India, but didn't quite adapt to the Indian market as much as it needed to. There were court cases about MSG levels in the chicken, and lack of vegetarian options meant that they had long ways to cover before they could gain the massive popularity they command today.

The Pizza Craze

More than burgers however, it was the pizza chains that helped overhaul the existent idea of dining. With various existing cafes and

food joints already serving small-sized pizzas with vegetable toppings and Amul cheese, we were all familiar with the dish as a snack. But here were brands advertising pizza as a meal in itself, and one that you could have with family and friends! The concept itself brought a cool quotient, and the large sized pizzas topped generously with stringy mozzarella, and mind-boggling choice of toppings that spanned pages, paired with a fashionable cola and garlic bread just widely appealed to the young Indian consumers. Head to a Pizza Hut outlet, slide into the booths and you'd be surrounded by the smell of freshly baked pizza, while the piping hot skillet in which the fluffy pizza would be served made it more of an 'experience' than a 'dish'. These pizzas were not really Italian, but that didn't matter – the adoption was authentic and wildly successful.

Quick Service Restaurant

I'm lovin' it!

Dining out for Indians, while not frequent, was a leisurely event. Ordering multi course meals, catching up on conversations, getting served course by course – always for the experience. So, of course,

Quick Service Restaurant was never really an accepted format in India before the 90's came and changed how we, as a nation, viewed the experience of dining out. With the emergence of these quick-service restaurants, customers could stand in queue, place orders off of colored photo displays behind the order counter and get plastic trays with food wrapped in paper. Quick service restaurants had heavy competition abroad, but in India, these brands could not simply set up benchmarks from existing formats that had seen success in the rest of the world – they had to completely rethink how to sell the idea in a country like India, that had been used to serving for the better part of the century, and then, to being serviced and waited upon for the last couple of decades. McDonald's was a pioneer in the field again – being the first to be able to successfully market the concept. They realized that since their main competition was the street food vendors – who had a leg up in speed of service and pricing – simply serving a localized menu wasn't enough, sourcing local to keep the costs down and products fresh was equally necessary. Over the years, they had several pricing cuts in order to make headway in the business. Subway, Dominos and several other brands followed their suit and thus, this new "branded affordability" that assured consumers of hygiene and food

safety, slowly nudged the general populace towards the comfortably guilt-free option of "better fast food".

Delivery

30 minutes or it's free

Today ordering in food from restaurants, cloud kitchens and even 5-star hotels has become common, especially in the past year with COVID-19 and series of lockdowns. But the advent of deliveries happened in the 90's, long before Food Panda and Swiggy even came to be. While most restaurants and eateries were focusing on customers dining in and creating experiences, Dominos had an enjoy-with-family-at- home positioning. They kept their outlets simple and basic, focusing mainly on takeaway and enabling efficient deliveries, – hence location was meticulously mapped and chosen for optimal delivery routes. And that's how we could get pizza in "30 minutes or it's free". House parties, work meetings, late nights in the office – pizza deliveries became the norm, with easy ordering and quick deliveries.

The Café Culture

A lot can happen over coffee!

India had been forever known for its chai stalls that sold tea and cigarettes and was usually thronged by office goers and college students. However, there were iconic Coffee Houses in Calcutta, and Bangalore that were thriving since over a century. India was also producing a lot of coffee that was majorly being exported. However, the way the western world consumed coffee was yet to become a trend in our country, mainly because of it was priced higher, and most of the domestic production was being exported. The entry of Café Coffee Day or CCD in 1996, was a radical move – using the coffee from plantations in Chikmagalur to make coffee and serve it in style. For the first time in India, there were frappes, cold coffees, lattes, cappuccino, espresso – more options than we knew, and it was addictive!

But these cafes did something more than simply popularizing coffee – they kickstarted a culture. They promised an experience and positioned themselves as connoisseurs of great quality coffee by simply curating a menu with a lot of good coffee options with prices stretched just enough to convey a sense of finery while at the same time being affordable. The new CCDs thrived on a basic but

functional food menu, and above all, great ambience – bringing the concept of trendy and chic American cafes, which could be used for meetings, casual dates, catching up or even working, into the urban Indian lifestyle. Coffee was no longer simply about sipping warmth, or a caffeine boost, or even a cigarette-break accompaniment. "A lot can happen over coffee", CCD claimed, and a lot did. South India had always been partial towards *filter kaapi,* so it was an extension of the love for the drink to explore more variety.

Coffee shops started popping up in every nook and corner in neighborhoods, and CCD's expansion made way for other brands like Costa Coffee, Barista, and eventually Starbucks to enter and even thrive in this tea drinking nation's market.

The 2000s

The last decade of the 20th century definitely left a lasting impact on food, in terms of concept, influences, consumption, expanding our horizon from what we were comfortable and familiar with, to where the world was at and going towards. Were all the changes embraced, adopted and successful? Maybe not. But entrepreneurs, chefs, businesses – all recognized the potential of food beyond just basic

necessity and a source of income. And subsequent years and decades just saw this idea taken further ahead – with concept restaurants, pop-ups and promotional menus, where chefs and restaurants would try and soft launch new ideas and recipes, to test the waters.

The food shows and series that started in the 90's became franchises in the subsequent years, when we had competitions and cook offs on television. Food graduated from being a functional aspect of our life, to an art, a skill to be honed and recognized. Masterchef's UK version came out in 1990, though it was a much later revival and adaptation of the 2009 Masterchef Australia that had taken it to an unimaginable scale as one of the top shows in the world. It was adapted in various other countries, including India. The transformation in food began to branch out and have its effect on other cultural media as well! Continuing the trajectory, in recent years, Chef's Table became the first original Netflix documentary series to be launched in 2015, receiving wide critical acclaim.

2000s saw the advent of gourmet food and its relatively slow adoption. But India has always been an extremely price-conscious market, so what works well in Europe might not quite take off in India or even in other parts of Asia. Now, two decades into the new

century, we have many more concept restaurants and menus around vegan, gluten free, purely organic, special dietary selections, non-dairy, meat substitutes and so much more. The ideas may have launched in the subsequent years, but looking back, it seems inevitable that most of the domino effect started in the 90’s. The 90’s were the testing grounds for what was to come – as a country, we had whet our appetite, and we were ready to try the new.

****

বাগ আছে হ্যায়

সৈকত পালিত

প্রচ্ছদঃ সৈকত পালিত

-১-

৩১.১২.৯৯

জাপান।

ঠিক রাত ১২টায় ইশিকাওয়া শহরে বিকিরণ নিয়ন্ত্রক যন্ত্রের সাংকেতিক আলো নিভে যায়।

ওনাগাওয়া অবস্থিত পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে হঠাৎ অ্যালার্ম বেজে ওঠে।

ওসাকা-য় টেলিযোগাযোগ বিভাগের প্রকাণ্ড মনিটরে গোলযোগ শুরু হয়।

জাপানের বৃহত্তম সেলুলার অপারেটর এন.টি.টি. ডোকোমো-র দপ্তরে মিনিটে মিনিটে নথিত হতে শুরু করে অচেনা অসংগতির অভিযোগ।

ফ্রান্স।

রাষ্ট্রীয় পরিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্রের আধুনিক যন্ত্র বিশেষে বিবিধ বেনিয়মী-ঝঞ্ঝাট ক্রমাগত মাত্রা ছাড়িয়ে যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

দাপ্তরিক সময় নির্ধারণে দায়িত্বরত ন্যেভাল অবসারভেটরির জাঁদরেল ঘড়ি অকস্মাৎ অচল হয়ে পড়ে।

বিবিধ গুপ্তচরী গ্রাউন্ড কন্ট্রোল বিভাগের তথ্য সংগ্রহক যন্ত্রও কাজ করা বন্ধ করে দেয়।

এবং ডেলাওয়্যার লটারির সমস্ত স্লট-মেশিন অনুজ্জ্বলে অবস্থান করে।

এই ঘটনাগুলিকে অবশ্য পূর্বাভাস-বিরাগী বলা যায় না।

তিন দিন আগেই অনেক ব্যাঙ্কের ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড অকার্যকরী হয়ে গিয়েছিল।

এছাড়াও, অস্ট্রেলিয়ার বাস-টিকিট নির্ধারক যন্ত্র ও সিঙ্গাপুরের সমস্ত ট্যাক্সির মিটার কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে, গত এক মাস যাবৎ।

হয়ত এরকম, বা ভিন্ন কোনও পরিস্থিতির আভাস পেয়েই, রাশিয়ায় অবস্থিত এমব্যাসির দরজা সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল অস্ট্রেলিয় সরকার।

সন্ধিক্ষণ-সম্ভাবনার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ৭ বছর আগে প্রযুক্তি বিষয়ক পত্রিকা, “কম্পিউটার-ওয়ার্ল্ড”-এ প্রকাশিত একটি তিন পাতার অনুচ্ছেদে। এবং দু’বছরের ব্যবধানেই একটি যোগ্য ডাকনামও স্থির করা হয়।

১৯৯৩।

দক্ষিণ আফ্রিকা-জাত ক্যানাডিয় কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার পিটার ডি ইয়্যাগার “ডুম্‌স ডে ২০০০” নামে প্রকাশিত এই তিন পাতার অনুচ্ছেদে অদূর অবস্থিত এক যাপনস্পর্শী ঝঞ্ঝাটের বর্ণনা করেন।

১২ই জুন ১৯৯৫।

ম্যাসাচ্যুসেটসে কর্মরত মার্কিন প্রোগ্রামার ডেভিড এডি, তার চিন্তিত চিঠিতে একটি সমগোত্রীয় বক্তব্যে প্রথমবার যে শব্দবন্ধের ব্যবহার করেন, তা আগামী কিছু বছর প্রচন্ড প্রমাদ ও পরবর্তী সময়ে নস্ট্যালজিয়া উদ্রেক করে চির জনপ্রিয় হয়ে থেকে যায়।

“ ওয়াই টু কে বাগ “ বা “ মিলেনিয়াম বাগ “।

-২-

ভেবে দেখলে, আমেরিকায় ডাক্‌ট টেপ বিক্রির বৃদ্ধি আর ভারতে ইঞ্জিনিয়ার উৎপাদনের ঝড়ের মধ্যে প্রাকৃতিক যোগাযোগ প্রায় অসম্ভব। তবে মহাভারতে বলেছে “ম্যায় সময় হুঁ”। নায়কের নামই যথেষ্ট। প্রকৃতির গোলিয়াথ-গতরে কিছু আকাশ ভাঙ্গা টুইস্ট চলকে, টি.আর.পি আঁচানো রিয়্যালিটি-শো-এর দেবতা , যুক্তির অল্টার ইগো – সময়।

যারা হোয়াইট হ্যাট জুনিয়ারের লোন শোধ করা এখনও শুরু করেননি, সেই দৃশ্যমান ব্যক্তিত্বদের প্রতি খানিক ভূমিকা সহ আলোচ্য সমস্যার বর্ণনা :

অনেক বেশী কাজ, তুলনায় কম সময় আর বিরক্তি-মুক্ত ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে মানুষের আবিষ্কার – শুরুতে মেশিন, পরে বিবর্তনের নিয়মে আরও বেশী ঝলমলে – কম্পিউটার।

ভাষার প্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষ ও অসাধারণ মেশিনের পারস্পরিক দুর্বোধ্যতার সমাধানে তৈরী হয় বিশেষ অনুবাদ মাধ্যম – প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গোয়েজ।

এই মাধ্যমে রচনা হয় স্বয়ংক্রিয় নির্দেশ বিন্যাস বা কোড এবং রচনা পদ্ধতিকে বলা হয় কোডিং।

দৈনিক যাপনের প্রায় সব কটা অভিমুখ, যেরকম ক্যান্ডি ক্রাশ, নেটফ্লিক্স, ইলেক্ট্রিক হিটার, ট্রাফিক লাইট, এমনকি ডিজিটাল ঘড়ি, সবের মূলে আছে একেকটা সফটওয়্যার, আর সফটওয়্যারের মূলে কোডিং।

কার্য্য-পরিধির প্যারামিটার অনুযায়ী, কোডিং বা নির্দেশ রচনায় যে কোনও মাপের ত্রুটিকে প্রযুক্তিজীবি আঁতেল গোষ্ঠি নাম দেয় 'বাগ' (বাংলায় জীবাণু)।

২০০০, অর্থাৎ Y2K এবং প্রোগ্রামিং ত্রুটি, অর্থাৎ বাগ; যুক্ত হয়ে জনপ্রিয় ক্ষুদ্রীকরণ Y2K বাগ।

কম্পিউটারে তথ্য সংগৃহীত হয় ০ এবং ১-এর ক্রমবিন্যাস পদ্ধতিতে। এই তথ্য নথিত হয় নির্দিষ্ট স্থান বা মেমরি স্পেসের বিনিময়ে। ৭০' দশকে এই মেমরি স্পেসের মূল্য তুলনাহীন হলেও প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে কম্পিউটারের সমাদর দ্বিগুণ তুলনাহীন হওয়ায় সর্বসম্মত ভাবে স্থির হয় তারিখের সরলীকরণ। ১২ই জানুয়ারি ১৯৭৮-কে লেখা হল ১২-০১-৭৮। মানে, চার অঙ্কের ১৯৭৮ কে ছোট করে দুই

অঙ্কের ৭৮ করা হল; অর্থাৎ অনায়াসে ধরে নেওয়া হল প্রথম দুটো সংখ্যা ১৯। আরো সহজ করে বললে, ৩১-১২-৯৯ অবধির সময় পুরোটা অশান্তিহীন হলেও, তার ঠিক পরের দিন ০০ সাল মেশিনের মতে ২০০০ না ১৯০০, তা মানুষের ধারণা ও দূরদর্শীতার বাইরে। প্রথম দর্শনে নিরীহ মনে হলেও, এর প্রভাবের সম্ভাবনা ছিল সার্বিক এবং গুরুতর।

বিদ্যুৎ ও ব্যাঙ্কিং বিভাগ ছাড়াও পরিবহন পরিষেবায় চূড়ান্ত প্রভাবের আশঙ্কা করা হয়েছিল।

ধরুন, ২০০০ সালের ৩রা জানুয়ারি ই.এম.আই-এর শেষ কিস্তি শোধ করতে গিয়ে জানতে পারলেন কম্পিউটারের মতে ওটা ১৯০০ সালের ৩রা জানুয়ারি, ফলে আরো ১০০ বছর আপনাকে লোন শোধ করে যেতে হবে।

অথবা, ২০০০ সালের ১লা জানুয়ারি এয়ারপোর্ট পৌঁছে দেখলেন আপনার দুপুর দু'টোর ফ্লাইট ছাড়তে এখনও ১০০ বছর বাকি।

বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সময়ের ভূমিকা এতটাই মৌলিক যে শতাব্দীর শুরুতেই পৃথিবীময় লোডশেডিং-এর সম্ভাবনাও অগ্রাহ্য করার মত ছিল না।

১৯৯৯ সালের অনেকটা অংশ কেটে গেল এই অন্ধকার অ্যাপোক্যালিপ্‌সের আপাত কামনায়।

—৩—

সঙ্কট সম্ভাবনার সর্বপ্রথম প্রভাব এসে আছড়ায় পৃথিবীর উজ্জ্বলতম প্রমাদ কেন্দ্র, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

শুরুটা হয় রাষ্ট্রীয় স্তরে।

১৯৯৮ সালে রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটন সমস্ত বেসরকারি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে “২০০০ রেডিনেস অ্যান্ড ডিসক্লোসার অ্যাক্ট”-এর অনুমোদন করেন । আসন্ন সমস্যায় নিজেদের পরিকল্পনা সম্পর্কে সরকারকে অবগত করার ফতোয়া দেওয়া হল এই অ্যাক্টে।

হোয়াইট হাউজ নিয়োজিত জন কসকিনেনের নেতৃত্বে একটি কমিটি এবং আপদকালীন পরিষেবা নিয়ন্ত্রক একটি স্বতন্ত্র সংগঠন ‘ফেমা’ (FEMA), যৌথ উদ্যোগে নিরীক্ষণ শুরু করে।

তখনও অবধি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল ইন্টারনেট । প্রতিকূল পরিস্থিতির নিরিখে ১৯৯৯ সালের ৩০শে জুলাই Y2K রাউন্ডটেবল গঠন করে নিয়ন্ত্রণী আইন চালু করা হল।

অযাচিত ভ্রান্তির আশঙ্কায়, রুশ সরকারের সাথে পারমাণবিক তথ্য বিনিময়ের সাময়িক চুক্তি পর্যন্ত আয়োজিত হল।

১৯৯৯-এর মার্চ মাসে ইউনাইটেড নেশান আয়োজিত Y2K সহযোগিতা সম্মেলনে ১২০টি দেশের রাষ্ট্র প্রতিনিধি অংশ নেয়।

১৯৯৯ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে, শুধু এই সমস্যার নিরিখে মোট ২০,০০০ কোটি ডলার ব্যয় করেছিল আমেরিকা।

সংবাদ মাধ্যমের প্ররোচনায়, এই উৎকণ্ঠা ক্রমে প্রশাসনিক স্তরের উচ্চতা ও গভীরতা থেকে নেমে প্রমাদপ্রবণ জনতার মধ্যে সঞ্চারিত হলে, প্রথম-বিশ্ব সুলভ স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় । খবর ছড়িয়ে পড়ে, ১৯৯৯সালের শেষে সভ্যতার বিলুপ্তি কেউ আটকাতে পারবে না । কিছু মৌলবাদী সংগঠন দাবি করল এটা ক্লিন্টন সরকারের ষড়যন্ত্র। Y2K সহায়িকা লিখে ও উপদেশ-মূলক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে কিছু ধর্ম প্রবক্তা রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলেন। জনতার একাংশ অতিরিক্ত খাদ্য-পানীয় সংগ্রহ করায় ওয়ালমার্টের মত সুপার-মার্কেটেও সরবরাহ ঘাটতি হলে, অন্য অংশের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়। বাজারে আসে Y2K কিট : যথেষ্ট খাবারের অভাবে টানা ২ সপ্তাহ জীবিত থাকার ম্যানুয়াল সহ একটি বাক্স, তাতে থাকছে কিছু হাই ক্যালরির বিস্কুট, এনার্জি ড্রিঙ্ক এবং ডাক্ট টেপ। বিশেষ করে ডাক্ট টেপের চাহিদা ও বিক্রি অভূতপূর্ব মাত্রা ছোঁয়।

অন্যদিকে বেসরকারি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গুলি ইতিমধ্যে Y2K ত্রুটির সমাধান কষে ফেলেছে। তারা এটাও জেনে গেছে যে এত কম সময়ে এই সমস্যা অতিক্রম করার মত যথেষ্ট কর্মী সংখ্যা আমেরিকায় নেই। তার অন্যতম কারণ – এই সমস্যার সমাধানে প্রাসঙ্গিক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গোয়েজ COBOL, বেশ কিছু বছর আগেই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গিয়েছে । সমকালীন মার্কিন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়াররা তখন উন্নততর মাধ্যমে কোড লিখছে। সমাধান জানা সত্ত্বেও তার প্রয়োগ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিল গোটা তথ্য- প্রযুক্তি বিশ্ব।

এই প্রকান্ড প্রশ্ন চিহ্নের উত্তর, কিছু মাস পরেই আবিষ্কৃত হয় ভারতবর্ষে।

—-৪—-

২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯।

দিল্লী।

কেন্দ্রীয় বাজেট অধিবেশনে অর্থমন্ত্রী যশোবন্ত সিংহ –

"মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়। ভারতীয় তথ্য প্রযুক্তির উজ্জ্বল ভবিষ্যত সম্পর্কে আমাদের কারোর দ্বিমত নেই। অতি দুঃখের বিষয় এই, যে আসন্ন Y2K-ক্রাইসিস সামলে ওঠার পক্ষে যথেষ্ট পরিকাঠামো ভারতীয় বাণিজ্য বর্গে এখনও তৈরি হয়নি। আমার প্রস্তাব, পরিকাঠামো তৈরীর আর্থিক সাহায্যের উদ্দেশ্যে আমাদের রাষ্ট্রকোষ এগিয়ে দেওয়া হোক, অন্তত এবারের বাজেট পরিকল্পনায়। "

তখনের সংসদেও, 'প্রস্তাব' এবং 'সিদ্ধান্ত' ছিল ব্যবহারিক রূপে সমার্থক ও আজকের মতই গণতান্ত্রিক।

আগামী সময়ে তথ্য প্রযুক্তির অর্থনৈতিক অবস্থান অনেকটা নির্ধারিত হয় এই ঐতিহাসিক বাজেট অধিবেশনেই।

শুরুতে অর্থনৈতিক উদারীকরণ আর শেষের দিকে প্রশাসনিক উদ্যোগ; এই ৯০ দশকীয় নিদর্শন ভারতীয় ভবিষ্যতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে থেকে যাবে।

ইনফোসিস, টি সি এস, উইপ্রো তথা সমগ্র তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্র তখন অসম্ভব উৎসাহে সিক্ত। হায়দ্রাবাদ ও ব্যাঙ্গালোর দ্রুত আই.টি হাবে পরিণত হয়ে উঠছে।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির কম সময়য়ের মধ্যেই আই আই টি নির্মাণে যন্ত্রবিদ্যা-মনস্কতার প্রমান দেয় ভারত। তবে ৮০-র দশকে বিশ্বায়ন পরিপন্থী রাজনৈতিক অবস্থানের কারনে ভারতীয় যন্ত্রবিদ্যা অন্যান্য দেশের তুলনায় কিছুটা পিছিয়ে ছিল। ঘটনাক্রমে এখানের সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়াররা COBOL-এর সাথে যথেষ্ট পরিচিত এবং পরিকল্পনা অনুসারে Y2K বাগ সংশোধনে পরিশীলিত । চিরকালের গরীব দেশ, ভারতের সাধারণ মানুষ তুলনামূলক কম বেতনে অভ্যস্ত। তাই আন্তর্জাতিক নজরে খুব স্বাভাবিক ভাবেই ভাবনাতীত উজ্জ্বল হয়ে উঠল ভারত। আমেরিকান এক্সপ্রেস , গোল্ডম্যান শ্যাক্স , ব্যাঙ্ক অফ আমেরিকা, সিটি ব্যাঙ্ক-এর মত কর্পোরেট নক্ষত্রদের প্রথমবার ভারতের ভূমিতে নেমে আসতে দেখা গেল এবং সহস্র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার পশ্চিমী জেল্লায় প্রবাহিত হল। H1b ভিসার এমন বাহুল্য এর আগে দেখা যায়নি।

১৯৯৯-এর আগে ভারতের জি.ডি.পি-তে আই.টি.সেক্টরের অংশ ছিল ১.২ শতাংশ , যা আগামী ৭ বছরে ৮.৫ শতাংশে পৌছয়।

১৯৯৯ থেকে ২০০৪-এর মধ্যে ভারতীয় সরকারের নিত্য উদ্যোগ, সিলিকন ভ্যালীর প্রবাসী ভারতীয়দের প্রচেষ্টা ও অনুকূল পরিস্থিতির সমন্বয়ে ভারতীয় তথ্য প্রযুক্তির

এই অনন্য উত্তরণের যে নজির, তার শুরুটা হয় একটি প্রোগ্রামিং ত্রুটি ও তাকে ঘিরে আন্তর্জাতিক অস্থিরতা থেকে।

—-৫—-

২০০০ সাল এলে, কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া বিশ্ব- ব্যাপী কোনও বড় মাপের ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। তবে পূর্ববর্তী আন্তর্জাতিক গণ-উৎকন্ঠা সম্পূর্ণ অর্থহীন ছিল না।

যুক্তরাজ্যের শেফিল্ড শহরে ১৫৪ জন স্থানীয় অন্তঃসত্ত্বার ত্রুটি বহুল নিরীক্ষণের দরুন সময়-পূর্ব অ্যাবর্শান এবং ডাউন সিন্ড্রোম আক্রান্ত সন্তান প্রসবের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

জাপানের অনেক পোস্ট অফিসে মুদ্রা বিতরণী প্রক্রিয়া ব্যাহত থাকে বেশ কিছু দিন।

বুল্‌গেরিয়ায় সরকারি নথি নিখোঁজ হয়ে যায়।

নেব্রাস্কা সহ অন্যান্য কয়েক এয়ার-পোর্টে দীর্ঘকালীন যানজট প্রত্যক্ষ হয় আগামী কয়েক সপ্তাহে।

সকল দেশের ইঞ্জিনিয়ারদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ২০০০ শুরু হওয়ার আগেই প্রায় সমস্ত ত্রুটি সংশোধন করা সম্ভব হয়েছিল। পরিসংখ্যান অনুযায়ী পৃথিবী জুড়ে মোট ৬০,০০০ কোটি ডলার খরচ করা হয় সংশোধন প্রক্রিয়ায়।

এটা ভারতের জন্য শুধুমাত্র আই.টি. উত্তরণের অকল্পনীয় ছবি ছিল না। অর্থনৈতিক সাফল্যের কারণে রাজনৈতিক ও সামাজিক স্তরে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং প্রীতি লক্ষ্য করা যায়।

২০০১ সালে থমাসন কলেজ অফ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর জাতীয়করণ হয়ে নতুন নাম হয় ‘আই আই টি রুরকি’।

২০০২ সালে ১৫টি আঞ্চলিক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজকে জাতীয় স্তরে উত্তীর্ণ করার সিদ্ধান্ত নেয় ভারতীয় সরকার। তাদের নতুন নামকরণ হয় ‘ন্যাশ্নাল ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি‘। জনপ্রিয় ক্ষুদ্রীকরণে এন আই টি (N.I.T)।

—ক্লিফ-সংহার—

গুনতে শুরু করলে দেখা যাবে সংখ্যার শেষ নেই। সংখ্যা অসীম কারণ যে কোনও সংখ্যার চাইতে বড় এবং ছোট একাধিক সংখ্যা থাকে। কিন্তু বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা, সম্পর্কের গভীরতা অথবা আদর্শের বাস্তবতার মতই কম্পিউটার মেমরিতেও বিজ্ঞাপনের সামান্য আড়ালেই একটা বস্তুগত সীমাবদ্ধতা জ্বলজ্বল করে। তাই ১৯৭০-এর ১লা জানুয়ারি কে প্রথম স্থানে বসিয়ে সেকেন্ডের পিঠে সেকেন্ড যোগ করে সংখ্যাসীমা অন্তর্গত সময়ের অনুবাদ করে কম্পিউটার।

২০৩৮ সালের ১৭ই জানুয়ারির পর এই যোগফল, যন্ত্র-সামর্থের দেওয়াল অতিক্রম করে যাবে। তারপর? এই প্রশ্ন চিহ্নের নাম ‘Y2K38 বাগ’।

৯৯৯৯ সালের পর ১০০০০ সালের নথিকরণ সমস্যার নাম ‘Y10k প্রবলেম‘।

আমেরিকায় কর্মরত এক প্রযুক্তিবিদের মতে “আমারা বারবার এরকম সমস্যার সম্মুখীন হব। এবং এভাবেই আরও নতুন বাণিজ্যিক দিক খুলে যাবে । বাজারের গর্তে বাজার নির্মান, এটাই বাজার-সক্রিয়তার সংজ্ঞা।”

কঠিন উত্তরের উপেক্ষায় এমন অবান্তর ওয়ান-লাইনার অতি সহজেই অকাট্য। শুধু বাজার নয়, প্রগতির উদ্দেশ্যেও এরকম পণ্যপায়ী মন্তব্যের ব্যবহার আমরা উদগ্রে গ্রহণ করে থাকি। যেমন – “স্থিতির সার্থকতা কেবল পরিবর্তনশীলতায়”। নিজেকে হজম করার মধ্যেই প্রকৃত পুষ্টি। মলিন বাস্তব দর্শনে ভার্চুয়্যাল-এর ঝকঝকে চশমা প্রয়োগ করেই এতটা পেশিপ্রধান ও চটকপ্রিয়, আমাদের অবচেতন।

ইউটোপিয়ার কল্পনায় যৌথ অবচেতনার এই উচ্ছিষ্ট, নিজের চরিত্র-সুলভ স্বাভাবিক নির্যাসে এরকম পরিচিত ওয়ান-লাইনার রচনা করে চলুক। সেটাই কাম্য। অন্যথায়, আনকোরা স্বতন্ত্র পর্যবেক্ষণ নিতান্তই ত্রুটি সাপেক্ষ।

****